টি কুইন

– তানিম হাসান

সুমির সঙ্গে আমার পরিচয় চিঠির মাধ্যমে। প্রথমে বন্ধুত্ব, সেই বন্ধুত্ব রূপ নিল ভালো লাগায়। ভালো লাগা থেকে ভালোবাসায় গড়ালো আমাদের সম্পর্ক।

পৃথিবীর কতোজন মেয়ে না দেখে কাউকে ভালোবেসেছে তা আমার জানা নেই। কিন্তু সুমি আমাকে না দেখে ভালোবেসেছিল। বলেছিল, রাজন, ভালোবাসার কোনো ব্যাখ্যা নেই। আমি তোমাকে ভালোবাসি।

আমার কোনো গুণ ছিল না। কাটা লাউয়ের মতো ফর্শা ছিলাম না। সুমির সামনে কখনো কৃত্রিম ব্যক্তিত্বও দেখাইনি। জানি না কালো, গুণহীন, ব্যক্তিত্বহীন একটা ছেলেকে সুমি কেন ভালোবাসে!

সুমির মুখে আমার অনেক প্রশংসা, আমার হাসি নাকি খুব সুন্দর, টেলিফোনে যখন কথা বলি তখন নাকি কিন্নর কণ্ঠের মতো মধুর শোনায় আমার কথা ইত্যাদি আরো অনেক কথা।

আমার বাড়ি ময়মনসিংহে, সুমি থাকে বরিশালে। বরিশালে চারবার গিয়েছি। যখন মোবাইলে বলি, সুমি এই বছর ডিসেম্বরে বোধহয় আসতে পারবো না, হাতে টাকা পয়সা তেমন নেই। সুমি আমায় বলে, কি বলো, এর আগেরবার এসে তুমি আমার হাতে তিব্বতীয় চা খেয়ে গিয়েছিলে। এবার এলে ইজিপ্টের চা খাবে। তোমাকে আসতেই হবে। আমার জমানো টাকা থেকে তোমাকে এক হাজার টাকা পাঠাবো। সেটা নিয়ে তুমি বরিশালে চলে এসো। এক বছর অনেক সময়, এক বছরে কি তোমাকে একবার দেখার প্রত্যাশা করতে পারি না?

এই কথা শুনে আমার নিজেকে সবচেয়ে বেশি ভাগ্যবান মনে হয়। কেন জানি না, সুমির নতুন হাতের চা খাওয়ার জন্য বরিশালে ছুটে যাই প্রতি বছর!

গত ডিসেম্বরে যখন তার বাসায় গেলাম সে হেসে বললো, রাজন, আমাদের বাড়ির সবাই রক্ষণশীল। কেউ চায় না তোমার সঙ্গে আমি বাইরে ঘুরতে যাই, কীর্তনখোলা নদী দেখে আসি। তুমি আমাকে বাইরে যেতে বলো না।

তখন আমার দাতগুলো বের করে বলি, প্রতি বছর তোমাকে বিরক্ত করে যাই। এ জন্য নিজেকে অপরাধী মনে হয়।

সুমি তার সমুদ্র গভীর চোখ দুটো ছল ছল করে বলে, এভাবে কথা বলো কেন তুমি?

সুমির প্রাণপ্রিয় মা কেন জানি ছেলের মতোই আমাকে আদর করেন। বলেন, জানো বাবা, তুমি আমার দ্বিতীয় পুত্র।

আমি তখন লজ্জায় মরে যাই।

সুমি মুখ টিপে হাসে বলে, রাজন, তোমার তো চা না হলে চলে না। তুমি মুখ ধুয়ে এসো। আমাদের বেসিনের ট্যাপে পানি নেই। টিউবওয়েল চেপে পানি রেখেছি বাথরুমে।

হেসে বলি, আমি তো হাত মুখ ধুতে ময়মনসিংহ থেকে বরিশালে আসিনি। এসেছি তোমার হাতের চা খেতে। তুমি বলেছিলে এবার ইজিপ্টের চা তৈরি করে খাওয়াবে।

সুমি আমার জন্য চা তৈরি করে নিয়ে আসে। বলে, রাজন, ইজিপ্টের চা পরেরবার এসে খেয়ো। এবার তিব্বতীয় চা খাও। সুমি আমার হাতে চায়ের কাপ দেয়ার সময় বললো, এই হলো বিখ্যাত তিব্বতীয় চা, খেয়ে দেখো তো কেমন হয়েছে?

যখন হাতে চায়ের কাপ নিলাম তখন গরম মশলার গন্ধ পেলাম। বললাম, এ কেমন চা তৈরি করেছো তুমি?

ও হেসে বলে, জানো রাজন, তোমার চায়ের প্রতি প্রচণ্ড আসক্তি বলেই বই দেখে দেখে বিভিন্ন দেশের চা তৈরি করার কৌশল শিখেছি। তোমার ঘরে গিয়ে প্রতিদিন তোমাকে চা তৈরি করে খাওয়াতে হবে নাকি বলো?

বলি, খাটি মধুর মতো কথা।

সে হাসে। সে আমাকে শিখিয়ে দিল কিভাবে তিব্বতী চা তৈরি করতে হয়। হেসে হেসে বলে প্রথমে এলাচ, গোল মরিচ এবং দারচিনি মিহি করে গুড়ো করতে হবে। তারপর গরম পানির মধ্যে সেটা ফুটতে দিতে হবে। দুই ঘণ্টা পানি গরম করে চাপাতা দিতে হবে এবং কাগজি লেবুর রস দিতে হবে। কাগজি লেবু না পাওয়া গেলে সাধারণ লেবুর রস দিলেই হবে।

গত বছরের ডিসেম্বর থেকে এখনো আমি সুমির বাৎলে দেয়া তিব্বতী রীতিতে চা তৈরি করে খাচ্ছি।

আমার মা তিব্বতী পদ্ধতিতে খুব আগ্রহের সঙ্গে চা তৈরি করে দেন। অবশ্য মাঝে মধ্যে এ নিয়ে কটু কথাও বলেন।

সুমির নাম দিয়েছি *টি কুইন*।

আমার দেয়া এই নামটা সানন্দে সে গ্রহণ করেছে।

ময়মনসিংহ থেকে

নিঃশব্দে

– ফেরদৌসী রাজ্জাক

আমার নানা চৌধুরীসাহেব চা খেতেন।

ওই চা খাওয়া দেখে একদিন আমিও তার সঙ্গে চা খাই। বলে রাখি, আমি তখন এসএসসি পরীক্ষার্থী। চা খেতে গিয়ে মুখের মধ্যে শব্দ হয়, চায়ের কাপ ও মুখের ভেতর সম্ভবত ঢোক গিলে ফেলার সময়।

এমনি সময় নানা বলে ওঠেন, তুই চা খাওয়া শিখবি কবে? চা খেতে শব্দ হচ্ছে কেন? এভাবে চা খেলে ভবিষ্যতে মানুষের মধ্যে লজ্জা পাবি।

বললাম, মানে, লজ্জা কিসের?

সঙ্গে সঙ্গেই আমি আবার চায়ে চুমুক দিয়ে ব্যাপারটি লক্ষ্য করি। সত্যিই তো, চা গলার ভেতর ঢুকতেই ঘৎ করে একটা শব্দ হচ্ছে।

তারপর অনেক চেষ্টায় শব্দটা নিয়ন্ত্রণে আনলাম এবং বুঝলাম এভাবে নিঃশব্দে চা খেতে হয়।

নানা ভুলটা না ধরলে আমি তো বুঝতাম না। ভদ্র সাজা যায়, ভদ্র হওয়া কঠিন।

নিঃশব্দে চা খাওয়ার ব্যাপারটি কঠিন ছিল। তবে অসম্ভব ছিল না, তাই তা পেরেছি।

চেষ্টা মানুষকে অনেক দূরে নিয়ে যায়। এটা স্পষ্ট হলো আর কি!

কালিবাড়িপাড়া, গাইবান্ধা থেকে

ডিম

- সাইফুল ইসলাম

১৯৯৭ সালের কোনো একদিন। সময়টা মাগরিবের নামাজের পর। আমরা তিনজন মাহমুদ, এমদাদ ও আমি রাস্তায় হাটছি। মাহমুদ ও আমিসহ বেশ কয়েজনের এক কমন নানা ছিল। নানার নাম ইউনুস মিয়া। এমদাদ ছিল নানার ভাতিজা।

যাহোক, রাস্তায় মৃদ বাতাসে হাটতে হাটতে ইউনুস নানার সঙ্গে দেখা।

মাহমুদ মুহূর্তে নানার কাছে চা খাবার বায়না ধরলো।

নানা আমাদের চায়ের দোকানে নিয়ে গেলেন। বললেন, কে কি চা খাবে?

মাহমুদ ছিল বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ। পারে না, হবে না, অসম্ভব এমন কিছু তার কাছে ছিল না। নয় কাজ হয় করার বান্দা সে।

যেমন বলা তেমনি উত্তর। কি চা খাবে জবাবে মাহমুদ বললো, ডিম চা (ডিম দিয়ে চা) খাবো।

আমি এমদাদ, নানা সকলে প্রতিবাদ করলাম। ডিম চা খাওয়া যায় নাকি, ডিম দিয়ে চা হয় নাকি ইত্যাদি। কার কথা কে শোনে? মাহমুদ দোকানিকে ডিম দিয়ে চা বানানোর নির্দেশ দিল।
প্রতি কাপে একটি করে মুরগির কাচা ডিম ভেঙে দিয়ে চা তৈরি হলো।

শংকরপুর, যশোর থেকে

চা- নো- য়ু

– হাসান মীর

জাপানিজরাও চা-কে চা (Cha) বলে, সেই সঙ্গে ও (O) ধ্বনি যুক্ত করে বলে ও-চা। একইভাবে পানিকে বলে *ও-মিজু* কিংবা জাপানিজ মদ (রাইস ওয়াইন) হয়ে যায় *ও-সাকে*। এই টানা স্বরের ও ধ্বনি অনেক ক্ষেত্রে বড় বা মহৎ কিছুকে বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়। যেমন *ও-হাশি* অর্থ বড় সেতু, *ও-আমে* অর্থ প্রবল বৃষ্টি ইত্যাদি।

জাপানিজরা সাধারণত দুধ-চিনি বিহীন সবুজ চা পান করে থাকে। ছাকনির ওপর চা পাতা রেখে গরম পানি ঢেলে দিলেই হলো। এই সুবজ চা সেই অর্থে সুস্বাদু নয়। তবে একটানা কয়েক দিন পান করলে আর খারাপ লাগে না। তাছাড়া সবুজ চা নাকি স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

হতেও পারে। কারণ প্রাচীনকালে চায়নার মানুষ তো ভেষজ ওষুধ হিসেবেই চা পাতার রস ব্যবহার করতো। পরবর্তীকালে দুধ-চিনি, আরো কতো কি মেশানোর প্রচলন হয়েছে!

তো আমরা যাকে লাল চা বা রঙ চা বলি, জাপানিজরা তাকে বলে *কো-চা*। এই কো-চায়ের সঙ্গে দুধ মেশালে হয়ে যায় মিরুকু টি। জাপানিজ উচ্চারণে মিরুকু অর্থ মিল্ক। কারণ জাপানিজ ধ্বনিতে এল বা ল নেই। ফলে ল হয়ে যায় র, যেমন লন্ডন হচ্ছে রনদন এবং বাংলাদেশ হচ্ছে বাংগুরাদেশ।

সে যাই হোক, এবার বরং চা উৎসবের প্রসঙ্গে আসি।

জাপানের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির আরো অনেক কিছুর মতো চা-ও এসেছে চায়না থেকে দশম শতাব্দীর দিকে। পরবর্তীকালে জাপানে চায়ের চাষ শুরু হয় এবং সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতে জাপানে আনুষ্ঠানিক চা পান উৎসবের প্রচলন হয়। এই চা উৎসবকে জাপানিজ ভাষায় বলে *চা-নো-য়ু* (Cha-no-yu)।

জাপানের *ওরিগামি* (কাগজ ভাজ করে নানান জিনিস বানানো), *ইকেবানা* (ফুল সাজানো), *বনসাই* (বড় গাছকে ছোট টবে বামন বানিয়ে রাখা), *হাইকু* (পাচ, সাত, পাচ মাত্রার তিন লাইনের কবিতা), *সুমো কুস্তি* কিংবা *সেন্তো* বা গণ-স্নানাগারের মতো এই চা উৎসবও জাপানিজ সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং জাপানের মানুষ এ নিয়ে গর্ব বোধ করে থাকে।

আমি আশির দশকের শেষ দিকে সাড়ে তিন বছর টোকিওতে ছিলাম। সেখানে আমার ফ্রেন্ড, ফিলোসফার অ্যান্ড গাইড ছিলেন রেডিও জাপানের সিনিয়র সহকর্মী এবং দীর্ঘকাল জাপান প্রবাসী ইসকান্দার চৌধুরী। তিনি কিছুদিন আগে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার বেতাগিতে নিজ গ্রামে ইন্তেকাল করেছেন।

টোকিওর আশপাশের টুরিস্ট স্পটগুলোতে অনেক সময় বিদেশি পর্যটকদের উপস্থিতিতে চা উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই আয়োজন দেখার মতো।

কেটলিতে পানি গরম করা থেকে শুরু করে চায়ের গুড়ো ঘুটে চা বানানো, সেই চা বিশেষ ধরনের পাতে পরিবেশন করা এবং পাত্রটি দুই হাতে ধরে ডান থেকে বামে ঘুরিয়ে একটু একটু করে সিপ করা সত্যিই উপভোগ করার মতো ব্যাপার।

চৌধুরী সাহেবকে এই চা উৎসবে অংশ নেয়ার জন্যে বেশ কয়েকবার প্রস্তাব দিয়ে ব্যর্থ হলাম। তিনি প্রতিবারই নানান অজুহাতে এড়িয়ে যান আর বলেন, হবে, হবে, যাক না আরো কিছু দিন।

শেষে সিদ্ধান্ত নিলাম, কেউ সঙ্গী না হোক, কোথাও চা উৎসব চোখে পড়লে একাই বসে যাবো। এক রবিবার সকালে টোকিওরই কোনো একটা পার্কে চা উৎসবের আয়োজন চোখে পড়লো। পাচশ ইয়েন জমা দিয়ে আমিও দলে শামিল হয়ে গেলাম।

শুনেছিলাম এ ধরনের আনুষ্ঠানিক চায়ের আসরে *উসু-চা* (Usu-cha) আর *কোই-চা* (Koi-cha) নামে দুই ধরনের চা পরিবেশন করা হয়। কোনটার ধরন কি জানা নেই। তবে আমাদের যে চা দেয়া হলো তা ছিল অনেকটা হামানদিস্তায় চা পাতা থেতো করে তার সঙ্গে কিছুটা পানি মিশিয়ে যেমন হয় সেই রকমের ফেনা ওঠা ক্বাথ জাতীয় কিছুটা তরল পদার্থ। মুখে দিতেই রীতিমতো কবিরাজি ওষুধ বলে মনে হলো। কিন্তু উপায় নেই। জাপানিজরা অনেক সময় পানির গ্লাস মুখে তুলেও *ওইশি* বা সুস্বাদু বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। সেক্ষেত্রে এতো আয়োজনের চা পান করে ওইশি বলবো না তা তো হয় না! সেই চায়ের সঙ্গে অবশ্য মিছরির মতো একদলা মিষ্টিও দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতেও রক্ষা হলো না। কোনো রকমে বার দুয়েক মুখে দিয়ে চায়ের পাত্র রেখে উঠে এলাম।

পরে ইসকান্দার চৌধুরীকে এই অভিজ্ঞতার কথা বলায় তিনি বললেন, আগেই তো আপনাকে নিষেধ করেছিলাম, এখন হলো তো? আসলে এটাই হচ্ছে জাপানিজদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, বাইরে থেকে যতোই আড়ম্বর আর আন্তরিকতা দেখাক না কেন, ভেতরের স্বাদটা ওই কবিরাজি ওষুধের মতোই।

চৌধুরী জাপানে ছিলেন প্রায় ত্রিশ বছর। তার অভিজ্ঞতাকে অবজ্ঞা করতে পারি না।

রাজশাহী থেকে

ভূতের শব্দ

– চয়ন জামান

তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। ফাইনাল পরীক্ষা চলছে। ইংরেজি সেকেন্ড পেপারের পরীক্ষা পরের দিন সকালে। ইংরেজি রচনা মুখস্ত করছিলাম (বলা উচিত রিভিশন দিচ্ছিলাম), ঠোটস্থ করতে করতে রাত প্রায় পৌনে একটা বেজে গেছে।

এদিকে রচনা ছাড়া কিছুই রিভিশন দিতে পারিনি। ভাবলাম এই ফাকে এক কাপ চা খেলে মন্দ হয় না। কিন্তু আমাদের মফস্বল শহরে তখনো গ্যাস আসেনি। অতএব ঐতিহাসিক মাটির চুলাই ভরসা। রান্নাঘরে গেলাম, কেঁলি চাপিয়ে অপেক্ষা করছি কখন পানি ফুটবে। চারপাশ নীরব, শান্ত...।

হঠাৎ মনে হলো রান্নাঘরের ওপাশ থেকে একটা দুর্বোধ্য শব্দ ভেসে আসছে। কৌতূহলী হয়ে রান্নাঘরের জানালা খুললাম। জানালার মাত্র ফুট দুয়েক দূরেই পাশের ঘর, শব্দটা আসছে ওই ঘর থেকেই।

সুপ্রিয় পাঠক, ক্লাস সেভেনে পড়া এক কিশোরের সঙ্গে প্রেমের পরিচয় আছে। কিন্তু নিশিপ্রেমের সঙ্গে পরিচয় তখনো হয়নি। ফলে ওই সব ঝড়ের মতো ফোস ফোস শব্দ বা চাপা গোঙানির মতো শব্দ ওই কিশোরের কাছে দুর্বোধ্যই বটে।

এদিকে আবার আমার রান্নাঘরের দরজা খোলার শব্দে, কাপ-প্লেট নাড়ার শব্দে আমার আপু জেগে গেছেন। তিনি যখন রান্নাঘরে ঢুকলেন। তখনো আমি জানালার গৃল ধরে ঝুলে আছি।

তিনি আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে বললেন, কি রে, তুই এতো রাতে রান্নাঘরের জানালা খুলেছিস কেন? আবার এভাবে ঝুলে আছিস কি মনে করে? পড়া কমপ্লিট হয়েছে?

তার প্রশ্নের বর্ষণে আমার অবস্থা তখন সব ফোটা কষ হারানো চায়ের পাতার মতো!

কোনো কিছু না ভেবেই উত্তর দিলাম, চা খাবো, চা খেয়ে পড়বো। বুকে তখন একটু সাহস ফিরে এসেছে। তাই যোগ করলাম, আপুমণি। ওখানে কি একটা বিকট শব্দ হয়েছিল, বলে পাশের ঘরটা দেখালাম।

আপু আসার পর শব্দটা থেমে যায়। তাই তিনি পুরোপুরি ব্যাপারটি ধরতে পারেননি। তবে কিছুটা বোধ হয় আচ করতে পেরেছিলেন। ফলে আমাকে ধমকে বললেন, রাত দুপুরে এসব শব্দ শুনতে যাস কেন? এগুলো ভূতের শব্দ, তোর ভাগ্য ভালো যে, আমি এসে পড়েছি, তা না হলে ওরা তোর ঘাড় মটকাতো।

আর যাই হোক, এ শব্দ ভূতের শব্দ, এ আমি মানতে নারাজ। আবার পুরোপুরি উড়িয়েও দিতে পারছিলাম না। কারণ ওনাদের ব্যাপারে আমার আবার কিঞ্চিৎ দুর্বলতা বা ভীতি ছিল। তাই আর এ ব্যাপারে কথা বাড়ালাম না। শুধু বললাম, চা খাবো।

তিনি বললেন, তুই গিয়ে পড়তে বস চা আমি নিয়ে আসছি।

আপু এখন বিবাহিত তাই রাত দুপুরে আজ-কাল আর চা খাওয়া হয় না। সেই সময়ের চা এখন মিশে আছে শুধু স্মৃতির সঙ্গে, পারিবারিক মায়ার সঙ্গে।

কুলাউড়া থেকে

অতিথিপরায়ণ

– মোহাম্মদ রেজাউর রহমান

আমি সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা। আমাদেরকে সিলেটে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সামরিক ট্রেনিংয়ে যেতে হয়। ১৯৯৮ সালে এ রকম এক ট্রেনিংয়ে সিলেট গিয়েছিলাম। প্রচণ্ড কষ্টের কোর্স। দীর্ঘ দুই মাসের। সময় যেন কাটতেই চায় না। প্রতি রাতে লেগেই আছে রেইড, অ্যামবুশ আর কর্ডন অ্যান্ড সার্চের অনুশীলন।

সারা দিন বসে বসে মাটিতে টার্গেট এলাকার নকশা বানাতে হতো আর সন্ধ্যায় সেই নকশার ওপর আদেশ প্রদান করতাম।

আপনারা যারা সিলেট সেনানিবাস দেখেছেন তারা জানেন, সেই সেনানিবাসের চারদিকে পাহাড় আর চা বাগান। অপূর্ব সব প্রাকৃতিক দৃশ্য।

দেখতাম দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন এসে সেই চা বাগানে ছবি তুলছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আমরা যারা কোর্স করছিলাম তাদের কাছে সেই সব সুন্দর দৃশ্য ছিল অসহনীয়। কারণ সেই চা বাগানের ভেতর দিয়েই আমাদেরকে হাটতে হতো ত্রিশ চল্লিশ কিলোমিটার, যা ছিল অত্যন্ত কষ্টকর।

চা বাগানের মধ্যে বাতাস প্রবাহিত হতো না। সব সময় থাকতো একটা গুমোট আবহাওয়া। সেই গুমোট আবহাওয়ার মধ্যে ঘণ্টায় ছয় কিলোমিটার বেগে হেটে চলা ছিল অত্যন্ত অস্বস্তিকর।

তাছাড়া সিলেটের চা বাগান যেন জোকের স্বর্গরাজ্য। যেখানেই বসবেন, সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার জোক যেন ছেকে ধরবে। নাভির কাছে জোক, ঘাড়ের কাছে জোক, হাতে জোক, কানে জোক। এসব জোকের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য গুল ব্যবহার করতাম। তাতে কিছুটা হলেও রক্ষা পাওয়া যেতো।

সিলেটের এই চা বাগানে আমাদেরকে সারভাইভালের অনুশীলন করতে হতো। চার পাচ দিন না খেয়ে থাকা, একেবারে না খেয়ে না, প্রচলিত খাবার না খেয়ে থাকা। আমাদেরকে কোনো প্রকার রেশন সরবরাহ করা হতো না। আমরা চা বাগানের আশপাশের জঙ্গল থেকে কলাগাছের ভেতরের শাশ, জংলি আলু, ঝরনার মাছ ইত্যাদি খেয়ে থাকতাম। দিনে ওই চা বাগানের মধ্যেই ঘুমাতাম।

দিনে আসলে ঘুমানোর সময় খুব কম পেতাম। খুব বেশি হলে এক দুই ঘণ্টা। কারণ রাতে বিভিন্ন অভিযানে বের হওয়ার প্রস্তুতি দিনের বেলাতেই নিতে হতো। সেই সময় পাহাড়ি ঝরনার পানি মনে হতো যেন অমৃত। আশপাশে চা বাগানের কুলিদের ছাড়া ছাড়া বাড়িঘর থাকলেও আমরা অনেকেই সেখান থেকে খাবার সংগ্রহের সুযোগ নিতাম না। কারণ ধরা পড়লে কোর্সে মাইনাস পাবার সম্ভাবনা থাকে যা অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ।

কিন্তু কেউ কেউ যে একেবারেই সুযোগ নিতো না তা নয়। সেই সুযোগ নেয়া দলের মধ্যে আমিও একজন।

ছোটকাল থেকেই আমার চা খাবার অভ্যাস। রীতিমতো যেন নেশা। সম্ভবত এসএসসি পরীক্ষার সময় এই অভ্যাসটা হয়েছে। তাই প্রথম এক দুই দিন চা না খেয়ে থাকলেও তারপর সহ্য করাটা অসম্ভব হয়ে পড়লো। যে আমি প্রতি দিন দশ বারো কাপ চা খাই, সে দুই দিন চা না খেয়ে ছিলাম।

তৃতীয় দিন আর পারলাম না। সঙ্গে আমারই মতো এক দুঃসাহসিককে নিয়ে বের হলাম চা শ্রমিকের বাসার উদ্দেশ্যে। রাত তখন সাতটা আটটা বাজে। চা শ্রমিকরা অনেক রাত করে ঘুমায়। সেদিন রাতে তাদের কি একটা অনুষ্ঠান ছিল। তাই সবাই জেগেই ছিল। এই চা শ্রমিকরা ছোটকাল থেকেই আমাদের মতো অনেককেই দেখেছে চা বাগানে অনুশীলন করতে। তাই তারা আমাদেরকে দেখে আশ্চর্য হলো না।

তাদের এক মহিলাকে অনুরোধ করলাম, এক কাপ চা খাওয়া যাবে কি না।

মহিলা আশ্চর্য হলেন না।

কিন্তু বুঝলাম, তিনি কিছুটা সমস্যায় পড়েছেন। কারণ তিনি যে বিব্রত বোধ করছেন তা বোঝা যাচ্ছিল। কি কারণে তিনি বিব্রত বোধ করতে পারেন তা বোঝার আগেই দেখি তিনি তার ছেলেকে পাশের দোকানে পাঠাচ্ছেন চাপাতা আনার জন্য।

আমরা কখনো চিন্তাও করিনি, তাদের বাসায় চা পাতা থাকবে না। কারণ চা বাগানের মধ্যে চা শ্রমিকের বাসায় চা সবচেয়ে সহজলভ্য সামগ্রী হবে বলে আমরা মনে করেছিলাম। তাই এখানে এসেছি গোপনে এক কাপ চা খাবার জন্য। তাদেরকে এভাবে বিব্রত করার কোনো ইচ্ছাই আমার ছিল না।

ওই মহিলাকে ব্যস্ত না হতে বলে আমরা উঠে চলে আসতে চাইলাম।

কিন্তু তিনি আর ছাড়েন না। জোর করে তার ছেলেকে দিয়ে দোকান থেকে চা পাতা এনে দশ মিনিটের মধ্যে গরম গরম এক কাপ রঙ চা বিস্কিটসহ খেতে দিলেন। বোঝাই যাচ্ছিল, অনেক কষ্টে সব কিছু জোগাড় করা। কিন্তু তার আন্তরিকতার জোয়ারে তিনি আমাদেরকে চিরকৃতজ্ঞ করে ফেললেন।

সেদিনের সেই চায়ের স্বাদ এখন পর্যন্ত আর কোনো চায়ে পাইনি। এই সুবাদে আমি আজও সিলেটের সব মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ সেই মহিলা আর সব চা শ্রমিকের ভালো করুক। বাংলাদেশিরা যে কি পরিমাণ অতিথি পরায়ণ জাতি তার প্রমাণ আমি সেদিন নতুন করে পেয়েছিলাম।

সাভার, ঢাকা থেকে

rezaira2002@gmail.com

মূল্যবান

- লায়লা আখতার জাহান

আমার দুটি ছেলেমেয়ে ঐক্য ও ঐশ্বর্য। ছেলের বয়স সাড়ে আট, মেয়েটার সাড়ে চার। খুব দুষ্টু এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন এই বাচ্চা দুটির সামনে আমি কখনো শান্তি করে এক কাপ চা খেতে পারি না। অনেক লুকিয়েও যদি এক কাপ চা নিয়ে বসি, ওরা দুইজন টের পেয়ে দৌড়ে দুটো কাপ এনে বলবে, আমরাও চা খাবো, আমাদেরকে চা দাও।

আর এই চা খেতে গিয়ে ঘটে যায় বিচিত্র সব কাণ্ড।

অফিস থেকে প্রায়দিন ফিরি মাথাব্যথা নিয়ে। একদিন মাথাব্যথার ওষুধ খেয়ে এক কাপ চা নিয়ে কেবল বসেছি, তখুনি বাইরে থেকে আমার ছেলে এসে উপস্থিত। ওর আসা টের পেয়ে গরম চা তাড়াতাড়ি করে গিলতে গিয়ে আমার গলা পুড়ে গেল। গরম চায়ের রাগটা ওর ওপর ঝাড়লাম। বললাম, বেয়াদবের বাচ্চা।

ও সঙ্গে সঙ্গে বললো, আম্মু, তাহলে বেয়াদব কে? তুমি, না আব্বু?

ওদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমাকে লজ্জায় পড়তে হলো। পরে ওই চা আমার আর খাওয়া হয়নি।

আরো একদিন বাইরে থেকে ফিরেছি মাথাব্যথা নিয়ে। এক কাপ চা বানিয়ে বিছানায় বালিশে মাথা উচু করে বসে আছি। বেডসাইড টেবিল থেকে চায়ের কাপটা হাতে নিয়েছি কেবল, ওই সময় আমার অতি আদরের দুই সন্তান দৌড়ে এসে চা খাওয়ার জন্য ঝাপিয়ে পড়লো আমার ওপর। মুহূর্তের মধ্যে কাপ উল্টে চা পড়ে গেল আমার জামা, বিছানার দামি চাদরের ওপর।

রাগের মাথায় ছেলের পিঠে জোরে তিন চারটা চড় দিলাম। ছোটটাকেও বকাবকি করি। ওরা কাদতে কাদতে ঘুমিয়ে পড়লো।

এক সময় লক্ষ্য করি আমার হাতের পাচ আঙুলের দাগ ছেলেটার পিঠের ওপর বসে গেছে। একজন মায়ের কাছে এ দৃশ্য অবশ্যই কষ্টকর। নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হতে থাকলো। অশ্রুসিক্ত চোখে আমার হাতটা ওর পিঠে বোলাতে থাকলাম। মনে মনে বললাম, আমার জামা, বিছানার দামি চাদরের চেয়ে আমার সন্তান অনেক বেশি মূল্যবান। ওরা তো আমার কাছে সামান্য একটু চা-ই চেয়েছিল, কোনো দামি জিনিস তো চায়নি।

এরপর সিদ্ধান্ত নিই ওদের সুবুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত চা খাবো না। আমার বাচ্চারা এখন কিছুটা বুঝতে শিখেছে। তবুও চায়ের কাপ হাতে নিলেই এক ধরনের আতংক হয়। এই বুঝি ওরা ছুটে এসে ধাক্কা মেরে চা ফেলে দেবে। জানি না, আমার এই আতংক কবে দূর হবে!

ঘোড়ামারা, রাজশাহী থেকে

গণি মিয়া

- এমরান আলী

তখন ক্লাস সিক্সে পড়তাম। বয়ঃসন্ধির কাছাকাছি একটা সময়। চা নামে মহা মূল্যবান পানীয় তখনো মুখে দিইনি। চা সম্পর্কে তখন আমার মোটামুটি ধারণা হচ্ছে এই ঝোল কেবল বড়রা দোকানে বসে খান এবং দেশ, রাজনীতি, সরকার জাতীয় কঠিন কথাবার্তা বলেন। যারা বড়লোক তাদের বাড়িতে চা বানানো হয়। যেহেতু আমরা বড়লোক নই সেহেতু আমাদের বাড়িতে চা বানানো হয় না।

আজ থেকে ছয় বছর আগের আষাঢ় মাসের মেঘ ডাকা দুপুরে কেউ যদি আমাকে লক্ষ্য করতেন তাহলে তিনি দেখতেন মলিন পোশাক পরা কুৎসিত এক বালক রাস্তার দাড়িয়ে আছে। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় চায়ের দোকানে কেন্দ্রীভূত। কারণ দোকানে তখন কয়েকজন চা খাচ্ছেন এবং শুনে কিছুই বোঝা যায় না এমন সব জ্ঞানের কথাবার্তা বলছেন।

এক কাপ চায়ের জন্য বালকের চোখ থেকে লোভ উপচে পড়ছে। কিন্তু বাবার কাছ থেকে টাকা চাওয়ার সাহস তার নেই। সে অসম্ভব লাজুক।

কোনোদিন চা খেতে পারবো এ রকম আশা এক সময় ছেড়েই দিলাম। দুই চোখে পৃথিবী জোড়া বিস্ময় নিয়ে *ভ্যাবলার* মতো চায়ের দোকানের সামনে দাড়িয়ে থাকাও কমিয়ে দিলাম।

চা একটি অতি তুচ্ছ পানীয়। এই তুচ্ছ জিনিসগুলোর প্রতি তখন আমার এমন প্রবল আকর্ষণ কেন হয়েছিল? আমার কাছে সহজলভ্য ছিল না বলে? আমি জানি না।

দারিদ্র সংক্রান্ত হীনম্মন্যতার জন্যই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক, ছোটবেলা থেকেই আমার তেমন কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়নি। যদি বলি, এখন পর্যন্ত কারো সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়নি তাহলে কি খুব ভুল বলা হবে? বোধ হয় না।

একদিন যথানিয়মে চায়ের দোকানের সামনে একা দাড়িয়ে আছি। দোকান ফাকা। দোকানি একাই বসে ঢুলছেন। তিনি চোখ তুলে তাকাতেই আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। সরু চোখে তাকিয়ে বললেন, এই দিকে এসো।

এগিয়ে গেলাম।

তিনি প্রায় হুংকার দিয়ে বললেন, তোমার ঘটনাটা কি?

ভীত স্বরে বললাম, কোনো ঘটনা নেই। এমনি দাড়িয়ে থাকি।

লক্ষ্য করলাম, তার রাগী মুখ হাসি হাসি হয়ে যাচ্ছে।

গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, চা খাও এক কাপ।

চুপচাপ দাড়িয়ে রইলাম। পকেটে পয়সা নেই, এই লজ্জার কথাটা কিভাবে বলি? তারচেয়ে চুপ করে থাকাই ভালো।

টাকা পয়সার কোনো দরকার নেই। মানি হলো গিয়ে তোমার হাতের ময়লা। চায়ের দামের জন্য গনি মিয়ার পরান পুড়বে না।

স্তব্ধ হয়ে গেলাম। চায়ের মতো একটা জিনিস বিনা পয়সার খাওয়াতে চাচ্ছেন নাকি তিনি? এও কি সম্ভব?

গনি মিয়া অতি দ্রুত এক কাপ চা বানিয়ে ফেললেন। বেঞ্চের ওপর বসে প্রবল উত্তেজনায় চায়ের কাপ হাতে নিলাম।

গনি মিয়া মমতা মাখা গলায় বললেন, আস্তে খাও। আর ফড়ুৎ ফড়ুৎ হচ্ছে কেন?

তখনো জানি না কিছুক্ষণের মধ্যেই এ মানুষটার জন্য আমার জীবনে কেয়ামত ঘটবে। আস্তে খেতে পারলাম না। প্রথম চা খাওয়ার উত্তেজনায় জিভ পুড়িয়ে ফেললাম।

চা খাওয়ার পর গনি মিয়া বললেন, এবার একখান সিগারেট খাও। গনি মিয়ার কাছে টাকা পয়সা কোনো ব্যাপার না।

চমকে উঠে বললাম, আমি সিগারেট খাই না।

আরে খাও। সিগারেট জিনিসটা সর্দির জন্যের উপকারী। তোমার তো মনে হচ্ছে সর্দি।

সর্দিতে উপকারী! তাহলে তো এই জিনিস বিনা পয়সায় পেলে ছাড়া যায় না। তাছাড়া সিগারেট জিনিসটা আমার পছন্দও হলো। নাক মুখ দিয়ে ধোয়া বের করাটা মজার ব্যাপারই হবার কথা। গনি মিয়া সিগারেট হাতে নিয়ে বসে আছেন।

গনি নামের এই চায়ের দোকানিকে খুশি করার জন্য হলেও সিগারেটটা নেয়া দরকার। হাত বাড়িয়ে গনি মিয়া ঘোষিত সর্দির ওষুধটা নিলাম।

গনি মিয়া বললেন, চা হলো গিয়ে সর্দির সর্বোৎকৃষ্ট ওষুধ। সিগারেটও কম না। ধরাও দেখি এবার।

ঠিক তখন যমদূতের মতো হাজির হলেন এক পাড়াতো চাচা ছোটদের বিভীষিকা আজিজ চাচা। পাড়ার ছেলেগুলোকে সাইজ করে রাখার পবিত্র দায়িত্ব তিনি তখন ঘাড়ে নিয়েছিলেন বলেই মনে হয়।

চাষা হুংকার দিয়ে বললেন, হারামজাদা, তুই সিগারেট খাস?

ভয়ে-লজ্জায় ততোক্ষণে মিইয়ে গিয়েছি।

আমার হয়ে জবাব দিলেন গনি মিয়া। পান খাওয়া দাত বের করে বললেন, মাঝে মধ্যে খায়।

দুনিয়া জোড়া বিস্ময় নিয়ে তার দিকে তাকালাম। বলে কি এই লোক!

খুবই বদমায়েস ছাওয়াল। ঘন ঘন সিগারেট খায়। কিন্তু কি আর করা! মাফ করে দেন।

চাচা বললেন, তোমার কাছ থেকে সিগারেট কিনে খায়?

গনি মিয়া সঙ্গে সঙ্গে বললেন, জি, টাকা পেলে আমি সিগারেট বেচবো না কেন?

আমি পুরোপুরি বোকা হয়ে গেলাম। আমার সামনে বসে থাকা গনি নামের এই মানুষটি পাগল নাকি! কাপা কাপাভাবে চাচাকে বললাম, চাচা, আমি সিগারেট কিনিনি।

কথাটা শেষ না হতেই প্রচণ্ড শব্দে এক রাম চড় খেলাম। চাচা হুংকার দিয়ে বললেন, শয়তান কোথাকার, ধর তোর সিগারেট।

কথাটা বুঝতে না পেরে করুণভাবে চাচার দিকে তাকালাম।

আগের মতোই জোরে আরেকটা চড় লাগিয়ে তিনি বললেন, আমার সামনে বসে এই সিগারেট শেষ কর।

তারপরের দৃশ্যটি হলো মোটামুটি এ রকম – আমি ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাদছি আর সিগারেট টানছি, টানছি। মানে মুখের মধ্যে ধোয়া নিয়ে নিচ্ছি। দোকানে শখানেক আগ্রহী দর্শক জমে গেছে। তাদের সবার চোখ–মুখ আনন্দে ঝিকঝিক করছে।

এগারো বছর বয়সী এক বালকের মানসিক শাস্তি দেখতে পারার আনন্দ।

আমি সিগারেট টান দেয়া বন্ধ করলেই চাচা হুংকার দিয়ে উঠলেন, খা শয়তান সিগারেট না খেলে তোর পিঠের ছাল তুলে ফেলবো। এতোটুকু বয়সে সিগারেট ধরেছো?

দোকানের সব লোক হাঃ হাঃ করে হেসে উঠছে। সবচেয়ে বেশি হাসছেন গনি মিয়া।

আমার এই ঘটনার চার পাচ দিনের মাথায় গনি মিয়া মারা গেলেন। তার খুব খারাপ ধরনের হার্টের অসুখ ছিল। বেচে থাকলে এই মানুষটিকে কিছু প্রশ্ন করতাম, গুরুত্বহীন প্রশ্ন।

আজিজচাচা এখন জানেন, সেদিন আমার দোষ ছিল না। তিনি আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।

আমি আবেগতাড়িত তরুণ, আমার অশ্রুগ্রন্থির পানি ছাড়ার ক্ষমতা অসাধারণ। সেদিন আমার চোখে পানি চলে এসেছিল। সেই পানি দুঃখের ছিল না আনন্দের ছিল ঠিক তখন বুঝতে না পারলেও পরে কিছুটা বুঝেছি।

গনি মিয়া এখন নেই। দোকানটায় এখন চা বানায় তার ছেলে। এই ছেলেটা তার বাবার চেয়ে ভালো চা বানায়। প্রায়ই তার চা খাই এবং প্রাণ খুলে প্রশংসা করি।

মৃত্যুর পর আলো এবং অন্ধকারের রহস্যময় জগতে গনি মিয়ার সঙ্গে দেখা হলে তাকে বিনীতভাবে বলবো, হ্যালো আংকল, আপনি কি জানেন, আমাকে চরমভাবে হেনস্তা করা সত্ত্বেও আমি কখনোই আপনার অমঙ্গল কামনা করিনি? কেবল ঔচিত্য বোধের পরিবর্তন কামনা করেছি।

ঘৃণা করার ক্ষমতা সব মানুষের সমান নয়।

ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া থেকে

আমাদের পরিবার

– কামরুল হাসান

আমার মা অত্যন্ত আধুনিক সুরুচি সম্পন্ন একজন গৃহিণী। সকালের নাশতায় তার প্রথম পছন্দ এক কাপ গরম চা। রুটির স্লাইস একটু ভেঙে পানি খেয়ে চায়ের কাপটি তুলে নিতেন।

আব্বার ব্যাপারটি ছিল একদম উল্টো। চা হলেও চলে, না হলেও চলে। শুধু যেন আম্মার ইচ্ছায়ই সকালের টেবিলে এক কাপ চা খেতেন।

এখনকার বাচ্চারা অনেক সৌভাগ্যবান। আমাদের সময় এমনটা ছিল না। ছোটদের চা খাওয়া এক রকম বারণ। চা খেলে ক্ষিধে নষ্ট হবে, দাত খারাপ হয়ে যাবে। এতো কিছুর পরও আমার ভাইয়াকে মানানো গেল না। চা তিনি খাবেনই।

চায়ের ব্যাপারটা আমাদের বাসায় নিয়ন্ত্রণ করতেন মেজআপা। মেজআপাকে আমরা ছোটরা সবই বুবু বলি। আব্বা, আম্মা আর নিজের জন্য চা তৈরি করতেন বুবু। তার কড়া শাসনে ছোটদের জন্য কখনো চা তৈরি হতো না।

ভাইয়া নাছোড়বান্দা। চা তিনি খাবেনই। প্রথম প্রথম চায়ের জন্য কান্নাকাটি করতেন। কাজ হলো না। তারপর নতুন একটা বুদ্ধি বের করলেন। চা খাবার সময় আম্মার পাশে বসে থাকতেন। আম্মা একটু চা দেন।

আম্মা শুনেও না শোনার ভান করতেন। আম্মার চা খাওয়া হয়ে গেলে কাপে থাকতো চায়ের তলানি? ওই তলানি দিয়েই ভাইয়ার চায়ে হাতে খড়ি। সকাল–সন্ধ্যার ওই বিশেষ সময়টি ভাইয়া আম্মার পাশে বসে থাকতেন শুধু চায়ের ওই তলানিটুকু খাবার জন্য।

আম্মা মাঝে মধ্যে ছোট আপাকে চা বানাতে বলতেন। তবে কড়া নির্দেশ, শুধু এক কাপ তার জন্য। উঠতি বয়সের মেয়েদের চা খেতে নেই। তাতে মুখের লাবণ্য নষ্ট হয়। ব্রনের সমস্যাটা আরো বেড়ে যায়।

ছোট আপা এমনিতে খুবই শান্ত গোছের মেয়ে। তবে চায়ের প্রতি তার প্রবল আসক্তি।

ব্যাপারটা আম্মারও অজানা নয়। চা খাবেন। এবং খুব গরম চা তার পছন্দ। পরম তৃপ্তি নিয়ে গরম চায়ে ফু দিয়ে চুমুক দেবেন।

আম্মা কিছুদিন নিষেধ করেছেন, এতো গরম চা খেয়ো না। মুখের ব্রনগুলো আরো বেড়ে যাচ্ছে। যাদের ব্রনের সমস্যা তাদের জন্য প্রচুর ঠাণ্ডা পানীয় ভালো।

আম্মা মাঝে মধ্যে আমাকে পাঠিয়ে দিতেন, দেখে আয় তো শিরিন রান্নাঘরে কি করছে?

আমি যাবার আগেই ছোট আপা চায়ের পেয়ালা লুকিয়ে ফেলতেন।

তবে একদিন আমি ঠিকই ধরে ফেললাম। শেলফের বড় কাসার বাটির নিচে চায়ের পেয়ালা লুকিয়ে রেখেছেন।

আমার স্মার্ট ও ফ্যাশনপ্রিয় বুবু চায়ের এতো ভক্ত ছিল, বিয়ের পর একদম বদলে গেলেন। দুলাভাই চা খান না। শুধু নিজের জন্য চা বানাতে তার ভালো লাগে না।

অথচ বিয়ের পর পর বুবুর চাপ্রীতির কথা তার শ্বশুরবাড়িতে পৌছে গেছে। প্রথম যখন শ্বশুরবাড়ি গেলেন, আমিও সঙ্গে।

বুবুর শাশুড়ি চমৎকার মানুষ। তিনি চাপাতা ও চিনি জোগাড় করে রেখেছেন। এক গাল হেসে বললেন, শহর থেকে বৌমা আসছে। শহুরে মেয়ে। চা খেয়ে অভ্যস্ত।

সন্ধ্যায় বাড়ির উঠানে চা খেতে বসে বুবুর ননদ ধরে বসলো, ভাবী, একটা গান করেন।

ততোক্ষণে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। চারদিকে আবছা আধার, গাছপালায় অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। এক মায়াবী সন্ধ্যা। শহুরে নতুন বৌয়ের গণ্ড গ্রামের উঠোনে বসে সান্ধ্য চায়ের সঙ্গে গান করা! বুবুর মনে পড়ে কি না জানি না। তবে লিখতে বসে আমার মনে পড়ছে।

আমার স্বাস্থ্য সচেতন চমৎকার মানুষ দুলাভাই ক্যান্সারে মারা গেছেন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রতিনিয়ত সংগ্রামের মধ্যে বেচে থাকা বুবুর এসব না মনে পড়াই স্বাভাবিক। জীবনের রূঢ় বাস্তবতার কাছে সোনালি স্মৃতিরা হারিয়ে যায় হয়তো বা।

চা খাবার জন্য আমার ছোট একটা লাল কাপ ছিল প্লাস্টিকের, খুবই সাধারণ। ভাইবোনরা সবাই হাসাহাসি করতো। তবে ওই লাল কাপ ছাড়া কখনো চা খেতাম না।

কোনো কারণে যদি সকালে বাসায় চা তৈরি না হতো দেখা যেতো বাসায় সবাই কেমন আলসেমিতে ভুগছে। কেউ শুয়ে আছে, কেউ বই নিয়ে বসে আছে। ব্যাপার কি! চা খাওয়া হয়নি। তাই শরীর ম্যাজ ম্যাজ করছে, ঘুম ঘুম লাগছে। রমজান মাসে ইফতারের পর চা এবং সেহেরি খেয়ে এক কাপ চা।

বুবু বলতেন, সেহেরিতে চা খেলে রোজার সারাটা দিন ঝরঝরে লাগে। ক্লান্তি গায়ে লাগে না।

এভাবেই শুরু। তারপর এটা একটা রুটিনে পরিণত হয় আমাদের বাসায়। চায়ে যদি একটু চিনি বেশি হতো তাহলে আম্মা বা হাতে চায়ের পেয়ালাটি সরিয়ে দিয়ে আমার বোনদের বলতেন, চা তো নয় যেন শরবত তৈরি করে এনেছিস।

অথচ আমার সেই মায়ের ডায়াবেটিস হওয়ার পর চায়ে একটু চিনি খেতে কি যে আবদার করতেন!

বয়স, সময়, পরিস্থিতিতে অনেক কিছুই পাল্টে যায়। আম্মার ক্রোকারি ক্যাবিনেট ভরা ছিল বিভিন্ন রকম চায়ের কাপে। যখন যেটা চোখে পড়তো কিনে আনতেন। গেস্ট বুঝে তিনি কাপ বের করতেন। পাশের বাড়ির প্রতিবেশী এলে যে সেটটি বের করা যায়, কনে দেখতে আসা পাত্রপক্ষকে সেই সেটটি দিয়ে আপ্যায়ন করা যায় না। এটা মায়ের কাছেই শিখেছিলাম।

আম্মার কালেকশনে ছোট কতোগুলো চিনা মাটির ডেকোরেশন কাপ ছিল শোকেসে সাজানো। বাড়িতে অতিথি এলে তাদের সঙ্গের ছোট বাচ্চারা বায়না ধরতো, ওই কাপগুলো দিয়ে খেলবো।

মা আমাদের ট্রেনিং দিয়ে রাখতেন। আমরা বলতাম এগুলো খেলার জন্য নয়। সাজিয়ে রাখার জন্য।

কোনো সেটের একটি কাপ বা পিরিচ ভেঙে গেলে আম্মা খুব মন খারাপ করতেন। বলতেন পুরো সেটটা কানা হয়ে গেল।

একটা কথা ভেবে আমি খুব অবাক হই, আমাদের এই চাভক্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের যেখানে বিয়ে হলো সেই পরিবারগুলো একদমই চাভক্ত নয়। ফলে দেখা গেল বিয়ের পর কম বেশি সবারই চা পান একটু কমে গেছে। আমার স্ত্রী সুযোগ পেলে হাসতে হাসতে বলে, দুপুরে তোমরা ভাইবোনরা যেভাবে চা ভাগাভাগি করে খেতে সেটা মজার ব্যাপার।

আমি বলি, তুমি বুঝবে কিভাবে, সবাই মিলে চা ভাগাভাগি করে খেতে যে আনন্দ, আজ বড় এক কাপ চা খেয়েও সে আনন্দ পাওয়া যায় না।

আমার ছেলে চা খেতে পছন্দ করে। তবে দুধ খেতে নয়। একটু বুদ্ধি করে অল্প চায়ের সঙ্গে দুধের পরিমাণটা বেশি করে দিয়ে বলি, আরমিন, তোমার চা। এখানে আমরা টেটলি, রেড রোজ-এর মতো নামকরা ব্র্যান্ডের চা ব্যবহার করি। কিন্তু এর স্বাদ কখনো বাংলাদেশের কাছাকাছি নয়।

বাংলাদেশের চায়ের স্বাদই আলাদা। কখনো কখনো পরিচিত, বন্ধুবান্ধব ডেকে বলেন, আসুন বাংলাদেশের চা খাওয়াবো। প্রবাসে দেশের সব কিছুই ভালো লাগে। সব কিছুর উপরে দেশ, আমার বাংলাদেশ।

টরন্টো থেকে

quamrulhassan@hotmail.com

অপমান

– নুরুজ্জামান

চায়ের জন্য অপমানিত হয়েছিলাম অফিসে। তখন নতুন চাকরি পেয়েছি আত্মীয়ের সুপারিশে একটি টেক্সটাইল মিলের হেড অফিসে হিসাব বিভাগে। সকালে অফিসের পিয়ন সবাইকে আদা চা দেয়।

বাসা থেকে খেয়ে গেলে অফিসে চা খেতাম না, না খেয়ে গেলে খাই। পিয়ন বড় কাপে চা দেয়।

পাশের রান্না ঘরে পিয়নকে ডেকে অফিস ম্যানেজার কুদ্দুস রাগত স্বরে বলতে থাকেন, এতো বড় কাপে ওকে চা দেবে না, ছোট কাপে দেবে, একবারের বেশি চা দেবে না।

কথাগুলো আমাকে শুনিয়েই বলেন, অথচ একবারের বেশি কখনো দুবার চা খাইনি। সেদিনের পর থেকে আর সেই অফিসে চা খাইনি।

পরবর্তীকালে আমাকে সেই অফিস ছাড়তে হয়েছিল।

এখন সকালে বাসায় এক কাপ রঙ চা খাই।

গাজীপুর থেকে

নিখাদ প্রীতি

– আবদুল আলীম বিন নুরউদ্দিন

পনের–ষোল বছর আগের এক নিঃস্ব গরিব পরিবারের কথা আজ বড় বেশি মনে পড়ছে। সংসারে একমাত্র কর্তার শেষ ব্যবসা হিসেবে বেছে নিয়েছেন এই স্বল্প পুজির চা ব্যবসা। ছোট মফস্বল এলাকায় তাদের বসবাস। সেই ছোট বাজারে খুলে বসেছেন একটা টঙ দোকানে চায়ের ব্যবসা, সঙ্গে তার শিশু পুত্র আলো।

ছোট আলো কিছু বুঝতে না চেয়ে পিতার কথামতো তার সঙ্গে কাজ করছে। মনে তার এতোটুকুই আশা, এবার তারা তিন বেলা তিন মুঠো খেতে পারবে।

মনের শিশু সুলভ সুপ্ত বাসনা তার এখানে মৃত প্রায়। আশা নেই তার আগামী দিনের। আশা তার বর্তমান। এ চায়ের ব্যবসা থেকেই কোনো মতে চলে যাচ্ছে তাদের সংসার। চলে যাচ্ছে দিন, পার হচ্ছে সময়।

কিন্তু নিয়তি বাদ সেধে বসলো, অসুখে পড়লো আলোর পিতা। সংসারের দায়িত্ব এসে পড়লো আলোর ওপর। একে তো শিশু আলো, তার উপর সংসারের চাপ। কি–ইবা করতে পারে সে! তবু পিতার চায়ের দোকান তাকে চালাতে হবে, হবে তিন বেলা খাবার জোগাড়ের পয়সা উপার্জন করতে। তাই শিশু আলো পিতার চায়ের দোকান নিজের হাতে চালাতে থাকে।

কিন্তু ব্যবসায় ভাটা পড়লো, বাদ সাধে তার বয়স। সবাই বলে, এই ছোট বাচ্চা কি চা বানাবে। তাই সহজে আলোর কাছে আসে না কেউ চা খেতে। এভাবে দিন চলে যায়, ব্যবসায় উন্নতি না হয়ে হতে থাকে অবনতি। সারা দিনের বিক্রির টাকা দিয়ে সামান্য কিছু বাজার, তার পিতার ওষুধ কিনতে গিয়ে আর টাকা থাকে না চায়ের পানি গরম করা জ্বালানি কেনার জন্য। তবু কি–ইবা করার আছে তার! পেটে তো কিছু দিতে হবে। তাই জ্বালানি কাঠের চিন্তা না করে দুপুরে দোকান বন্ধ করে বাসায় ফিরে বাজার ও ওষুধ রেখে চলে যায় বনে। দোকানের জ্বালানি কাঠ জোগাড় করার জন্য।

দুপুরের প্রচণ্ড দাবদাহে পুড়ে আলো নিয়ে আসে চায়ের পানি জ্বালানোর জন্য কাঠ। তা দিয়েই চালাতে থাকে তার চায়ের দোকান। পিতার অসুস্থতার কারণে কোনো মতে চলছিল তার চায়ের দোকান। কিন্তু একবার তার হাতে বানানো চা যে খেয়েছে সে আর অন্য কোথাও গিয়ে চা খায় না, ফিরে আসে আবার আলোর দোকানে চা খাওয়ার জন্য।

এভাবেই ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে তার দোকানে চা বিক্রি। পিতা সুস্থ হলেও দোকানে আসতে পারছিল না দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে। ফলে আলোর ওপরই এ চায়ের দোকানের আয় দিয়ে সংসার চালানোর ভার রয়েছে। আলোও যেন নিজের জীবনের আলো দিয়ে তিল তিল করে গড়ে তুলতে শুরু করেছে তার সংসারটাকে। নিজেকে মিশিয়ে ফেলেছে চায়ের সঙ্গে। চা ছাড়া সে যেন কিছুই ভাবতে পারে না, এই চায়ের প্রতি ভালোবাসা তাকে অন্যদিকে ফেরাতে পারেনি।

দিনে দিনে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন তার পিতা। ততোদিনে তার চায়ের ব্যবসা তুঙ্গে। এই চায়ের সঙ্গে ভালোবাসার কারণে তাকে সইতে হয়েছে আঘাত, দিতে হয়েছে রক্ত।

একদিন চায়ের কেৎলি পরিষ্কার করার জন্য কলে গিয়েছে। টিউবওয়েলের হ্যান্ডেলে চাপ দিতে স্লিপ করে এসে তার থুতনিতে আঘাত হানলো, তাতে করে সেখানে তৈরি হলো একটি ক্ষত চিহ্ন। ঝরে পড়লো বেশ কিছু শাণিত ধারা।

চায়ের দোকানে ব্যবসা করলেও পিতা যখন এসে আবার দোকানের হাল ধরলেন তখন আলোর সাধ জাগলো লেখাপড়া শেখার আর তা পিতাকে বলতেই পিতা তাকে তাদের দারিদ্রের কথা বলেন। তবুও আলোর জ্ঞানের আলো আহরণ করার সাধ দমে যায়নি। এবং সে কারণে অন্যের চায়ের দোকানে থাকার সুবাদে

নিজের শিক্ষা জীবন শুরু করতে পারে এবং ততোদিনে তার ছোট ভাই পিতার দোকানে সাহায্য করার মতো হয়ে উঠেছে।

আলো অন্যের চায়ের দোকানে সারা দিন শ্রম দিতে থাকে। বিনিময়ে তিনবেলা খাওয়া ও লেখাপড়ার সুযোগ এবং খরচ দিতে সে রাজি হয়। এভাবেই চায়ের সঙ্গে জীবনকে গড়ে নিয়েছে একটি ছেলে এবং সেই কিশোর ছেলেটি দায়িত্ব নিয়েছে সংসারের ও ছোট ভাইবোনদের। এবং সেখান থেকেই শুরু হয়েছে তার শিক্ষা জীবন ও কলম ধরা, চা এবং শিক্ষা তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আজ বিশ বছর পর তার হাতে হয়তো চায়ের কেটলি নেই, আছে কলম। এই কলম তার সেদিনের সেই চায়ের বদৌলতেই হাতে উঠে এসেছিল। আজ আলোর বড় বেশি মনে পড়ে সেদিনের সেই চায়ের সঙ্গে তার মধুর সম্পর্কের স্মৃতির কথাগুলো। আজও চায়ের দোকানে চা খেতে গেলে মনে পড়ে তার ফেলে আসা সেই অতীত। এবং তখনই তার মনে পড়ে এই সামান্য চা অসামান্যভাবে অনেক মধ্যবিত্ত ও নিম্ন, গরিব মানুষের আয়ের উৎস।

এ থেকে তার মতো অনেক শিশু–কিশোর নিজেদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে এনেছে এবং আনছে। তাই আলো আজও চা–কে ভালোবাসে, বড় বেশি ভালোবাসে যেন প্রিয়ার সুন্দর ভালোবাসাই খাদ আছে। কিন্তু নির্মল চায়ে কোনো খাদ নেই।

মহেশপুর, ঝিনাইদহ থেকে

দ্বিগুণ লাভ

– কবির হোসেন

দোকানে প্রচণ্ড ভিড়। কেউ শার্ট, প্যান্ট, কেউ লুঙ্গি, পাঞ্জাবি পরে এসেছে। কালো প্যান্ট ও শাদা পাঞ্জাবি পরে দাড়িয়ে আছে যার জন্য ভিড় সেই কাঙ্ক্ষিত বর (জামাই)।

আমাদের মফস্বল শহরে বিয়ের সময় দোকানে কেনাকাটা করতে ছেলেপক্ষ ও মেয়েপক্ষ উভয়ই আসে। ছেলেপক্ষ খেয়াল রাখে ছেলেদের শার্ট, প্যান্ট, জুতো এগুলো উন্নতমানের কেনা হয় নাকি কম দামেরটা কেনে এবং মেয়েপক্ষ খেয়াল রাখে মেয়ের জন্য খারাপ বা কম দামি কিছু কেনে কি না।

একের পর এক ঝলমলে শাড়ি নামানো হচ্ছে।

মেয়েপক্ষ বলছে, আরো ভালো শাড়ি দেখান। দেখতে দেখতে লাল জরির পাড়ের একটা শাড়ি দেখলো। সব সময় পরার জন্য সুতি শাড়ি কিনলো। মেয়েপক্ষের একজন বললো, মেয়ের মায়ের এবং মেয়ের নানি ও দাদির জন্যও শাড়ি কিনতে হবে।

এরপর ছেলেপক্ষের পালা। প্যান্ট, শার্ট ও লুঙ্গি কেনা হলো।

কিন্তু বর বলে উঠলো, এই লুঙ্গি সে কিনবে না। কারণ এই লুঙ্গির সঙ্গে রুমাল ও টুপি নেই। অবশেষে লুঙ্গি পাল্টিয়ে রুমাল ও টুপি থাকা স্ট্যান্ডার্ড লুঙ্গি কেনা হলো।

বরকে টুপি পরিয়ে দেয়া হলো, রুমাল চলে গেল বরের নাক ঢাকার জন্য।

এবার কাপড়ের দাম ধরার পালা। প্রতিটি কাপড়ের নাম ও দাম লিখে চার্ট করে দেয়া হলো। কিন্তু এতো দাম হতে পারে না।

শুরু হলো দামাদামি, হঠাৎ একজন বলে উঠলো, এতো কিছু কিনলাম, কোনো পান নেই, চা নেই।

পান এনে মুরুব্বিদের ঠাণ্ডা করা হলো।

কিন্তু যুবকরা কি খাবে। যুবকদের অনেকের ইচ্ছা সিগারেট খাওয়ার কিন্তু মুরুব্বিদের সামনে কি করে খাবে! যুবকরা চাচ্ছিল দোকানে যখন এসেছি, তাহলে আর সুলতানি বিড়ি কেন, বেনসনই খাবো।

ভেবে দেখলাম, বেনসন চার টাকা আর চা দুই টাকা। বেশি খরচ করে কি লাভ!

বললাম, আপনারা বসুন, আপনাদের জন্য চা আনা হচ্ছে।

রঙ চা নিয়ে এলো। সবাই ইস্পাহানি টি ব্যাগ চায়ের কাপে উঠিয়ে–নামিয়ে রঙ গাঢ় করছে।

চা আর পানের সুবাদে সবাই ঠাণ্ডা। আমাদের কাপড় বিক্রিও হয়ে গেল।

গ্রামের বিয়েতে চা খাওয়ালেই দামাদামি ছাড়া দিগুণ দামে কাপড় বিক্রি করা যায়। এতে আমরা দোকানদাররা যেমন খুশি তেমনি খুশি চাপ্রিয় ক্রেতারা।

ভোলা থেকে

ভালোবাসা না দাম

– ফরহাদ হোসেন

আমার এক পরিচিত বড় ভাইয়ের শালিকার সঙ্গে মোবাইলে এসএমএস, মিসকল এবং ইয়েসকলের মাধ্যমে মোটামুটি একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

যখন সে মিসকল দেয় তখন আমার বুকের মধ্যে খচ করে ওঠে। যখন সে এসএমএস পাঠায় তখন মনে হয় আমার শরীরটা দোলনায় দুলছে আর যখন ইয়েসকল পাই তখন নেশার ঘোরে থাকি। কারণ তার কণ্ঠে এতোটা মাদকতা যেন মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত শুনে নড়ে উঠতে চায়।

তার সঙ্গে একদিন দেখা হলো।

এমনি করে তার সঙ্গে মাঝে মধ্যে দেখা হয়, কথা হয় আর মোবাইলের কার্ড কিনতে কিনতে আমার রক্ত বিক্রি করার উপক্রম হয়েছিল। মোবাইলে তার সঙ্গে যখন কথা বলতাম তখন আমার মোবাইলের হয় কার্ড শেষ হতো, না হয় চার্জ শেষ হতো। ফোনে বেশি কথা খরচ করার যদি কোনো পুরস্কার থাকতো নিশ্চিত গ্রামীণ ফোন থেকে আমাকে পুরস্কৃত করা হতো।

তার সঙ্গে এমন একটি সম্পর্ক হলো, না বন্ধুত্বের, না প্রেমের ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। যদিও তাকে ভালোবাসি তবুও আমাদের ভালোবাসার সম্পর্কটা নিশ্চিত করার জন্য সামনাসামনি বলতে পারবো না ভেবে মোবাইলে একটি এসএমএস পাঠালাম, I Love U. Do u love me?

আমার এসএমএস সেন্ড হওয়া মাত্রই আরেকটি এসএমএস আমার মোবাইলের স্ক্রনে ভেসে উঠলো। খুলে দেখি I am sorry.

সেন্ডার স্মৃতি। হ্যা, সেই মেয়েটির নাম স্মৃতি। বুঝলাম সে হয়তো এসএমএসটি অনেক আগেই লিখে রেখেছিল। সে হয়তো বুঝতে পেরেছিল একদিন এমন কিছু ঘটবে। পরবর্তীকালে তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাইলেও সে রাখেনি। তার সঙ্গে আমার সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল।

প্রেমের সম্পর্ক নিশ্চিত করতে গিয়ে না প্রেমের, না বন্ধুত্বের এ সম্পর্কটিও নিজ হাতে হত্যা করলাম ভেবে নিজেই কষ্ট পাই।

আমি থাকি লালবাগে, স্মৃতি থাকে কাফরুলে। হঠাৎ একদিন ইডেন মহিলা কলেজের সামনে পড়ন্ত বিকেলে তার সঙ্গে আমার দেখা হলো। বললাম অনেক দিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হলো চলো বসি।

সে বললো, না, আমার কাজ আছে।

বললাম, অন্তত এক কাপ চা খাই। বলে তাকে অনেক অনুরোধ করলাম।

অবশেষে সে রাজি হলো বটে কিন্তু সময় বেধে দিল এক কাপ চা খেতে যেটুকু সময় লাগবে সেটুকু সময় সে বসবে।

এটা আমার জন্য চাদ হাতে পাওয়ার মতো মনে হলো। এক কাপ চা তো পাশে বসে খেতে পারবো এটাই বা কম কিসের!

ঢাকা শহরের ফুটপাথে যতো চা বিক্রি হয় তার মধ্যে উন্নত মানের এবং সর্বোৎকৃষ্ট মানের চা তৈরি হয় ইডেন কলেজের সামনে। এটা আর কেউ জানুক ইডেন কলেজের মেয়েরা এবং ঢাকা কলেজের ছেলেদের জানতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। যেহেতু আমিও ঢাকা কলেজের ছাত্র সেহেতু এটা আমার অজানা ছিল না। তাই অন্য কোথাও না গিয়ে ইডেন কলেজের সামনেই বসে পড়লাম।

চা বানানেওয়ালা মামাকে দুই কাপ স্পেশাল চায়ের অর্ডার দিলাম।

দেখলাম একটি পিচ্চি চা নিয়ে আসছে।

মামা, চা লন।

দুজন দুই কাপ চা নিলাম তার হাত থেকে।

আমাদের ভেতরে কোনো কথা হচ্ছে না।

স্বাভাবিকের তুলনায় চা প্রচণ্ড গরম, শীতের সকালে শিশিরের কণা যেমন ঘাসের ওপর পড়ে থাকে চায়ের কাপের ওপর হাত রাখলে ঠিক তেমনটিই হচ্ছে।

দুজন চায়ের কাপ ধরে বসে আছি। আমরা কোনো কথা বলার প্রসঙ্গ খুজে পাচ্ছি না। হঠাৎ করে স্মৃতি বললো, তুমি যদি ত্রিশ সেকেন্ডে এই চা খেতে পারো তাহলে তোমাকে আজ একটা জিনিস উপহার দেবো।

ত্রিশ সেকেন্ডে এই চা খাওয়া অসম্ভব এটা যেমন স্মৃতিও জানে তেমন আমিও জানি।

কি আর করা! তার কথায় রাজি হয়ে গেলাম। উপহার হিসেবে যদি ভালোবাসা পাই – না হয় আমার কলিজার টুকরার জন্য আমার কলিজাই পুড়বে, এই তো বেশ।

ইতিমধ্যে মোবাইলের ফাংশন থেকে স্টপ ওয়াচ বের করে ধরেছে। আমি চা খাওয়া শুরু করা মাত্রই সেও স্টপ ওয়াচে স্টার্ট দিল।

গরম চা দ্রুত খাচ্ছি আর আমার চোখ মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে, চোখে পানি টলমল করছে।

সে একবার আমার দিকে তাকাচ্ছে, আরেকবার মোবাইলে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। কৃকেট খেলায় যখন এক বলে এক রান দরকার ঠিক সেই মুহূর্তে উৎসুক দর্শকের দৃষ্টি যেমন খেলার প্রতি থাকে ঠিক তেমনই এক দর্শক হয়ে বসে আছে স্মৃতি।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ত্রিশ সেকেন্ডে চা শেষ করতে পারিনি।

স্মৃতি বিজয়ের হাসি দিয়ে ধীরে ধীরে চা খেয়ে চলে যাওয়ার সময় বলে গেল, অন্যের মজার খোরাক না হয়ে নিজেকে ভালোবাসো। আরো বেশি সুখ পাবে।

সে একবার পেছন ফিরে শুধু দেখলো।

ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে মাথা নিচু করে বসে রইলাম। কিন্তু দেখলো না সে আমার বুকের মধ্যে কলিজা পোড়ার ছাই আর গরম চায়ে ফোসকা পড়া জিভ।

যদি আমার কোনো পুণ্য কাজে বিধাতা খুশি হয়ে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি চাও, সেদিন বিধাতাকে বলবো, যদি সেদিন ত্রিশ সেকেন্ডে ওই চা খেতে পারতাম তাহলে স্মৃতি আমাকে কি উপহার দিতো?

ভালোবাসা, নাকি চায়ের দাম?

লালবাগ, ঢাকা থেকে

মাশরুম

– মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম

মাশরুম সম্বন্ধে দুই চার কথা বলি। আমরা অনেকেই মাশরুমকে ব্যাঙের ছাতা (বিষাক্ত) হিসেবে জানি। কিন্তু খাওয়ার উপযোগী মাশরুম হলো এক ধরনের ছত্রাক যা অত্যন্ত পুষ্টিকর, সুস্বাদু ও ওষুধি গুণ সম্পন্ন সবজি হিসেবে বিশ্বে পরিচিত।

প্রাচীন ফারাও সম্রাটরা মাশরুমকে দেবতার খাবার হিসেবে মনে করতেন। গৃকরা মনে করতো ঝুকিপূর্ণ লড়াইয়ের ময়দানে জয়লাভের জন্য প্রয়োজনীয় শৌর্য বীর্য যোগাতে পারে মাশরুম। চায়নিজরা অমরত্মের সন্ধানে মাশরুম খাওয়া শুরু করে। আর হাদিস শরিফে মাশরুম বেহেশতি খাবার হিসেবে উল্লেখ আছে।
গবেষণায় শুকনা ওজনে মাশরুমে আছে আমিষ পচিশ ত্রিশ শতাংশ, ভিটামিন ও মিনারাল সাতান্ন থেকে ষাট শতাংশ, চর্বি পাচ থেকে ছয় শতাংশ এবং শর্করা চার থেকে ছয় শতাংশ। সর্বোপরি বিবেচনায় আমাদের দেশের পুষ্টিহীনতা দূরীকরণে মাশরুম মিরাকাল ফুড হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।
সাভার থানা কৃষি অফিসের উপসহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নূরজাহান বেগম দুইশ-র বেশি রেসিপি তৈরিতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত। পাউডার মাশরুম সুপে, বিভিন্ন রকম রান্নাকে সুস্বাদু করার জন্য ব্যবহৃত হয়। অনেকেই চায়ের সঙ্গেও পাউডার মাশরুম খেয়ে থাকেন যা চায়ের স্বাদকে বৃদ্ধির পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান পাওয়া যায়। তাই কোনো দোকানি যদি লিখে রাখেন, *এখানে মাশরুম চা পাওয়া যায়* যা তার আর্থিক লাভের সঙ্গে আপামর জনসাধারণের পুষ্টি চাহিদার সহায়ক হবে।

হার্ডিঞ্জ বৃজ এবং চায়ের উৎপত্তি

বাংলাদেশে বর্ষাকালে নয়াভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত শহর পাকশি। বৃটিশ সরকার উপমহাদেশে নিরবচ্ছিন্ন ট্রেন ব্যবস্থা চালু করতে ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রমত্তা পদ্মার ওপর নির্মাণ করে বাংলাদেশের দীর্ঘতম রেল সেতু হার্ডিঞ্জ বৃজ। আর এই বৃজ নির্মাণে হাজার হাজার শ্রমিক জড়িত ছিল। মুরুব্বি বয়স্কদের কাছে শোনা, এসব শ্রমিকদের কর্মক্লান্তি দূর করাতে, নতুনভাবে কর্মে উজ্জীবিত করাতে, সর্বোচ্চ কায়িক শ্রম পাওয়ার জন্য তৎকালীন রেল কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ফৃ চা খাওয়াতো পাকশি থেকে সাত কিলোমিটার দূরে ঈশ্বরদী রেল স্টেশনে। যোগাযোগ বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হতো বাংলাদেশের একমাত্র ফৃ ট্রেন সার্ভিস পাকশি টু ঈশ্বরদী পাইলট ট্রেনের মাধ্যমে।
এভাবেই এই এলাকায় চায়ের প্রচলন শুরু হয়।

gurpukur@gscience.net

চায়ে হালিব

- রিপন রহমান

চাকরির শুরু দুম্বার সঙ্গে। একদল দুম্বা নিয়ে সারা দিন চরাই। সন্ধ্যায় তাবুতে ফিরে মালিকের দেয়া সাপ্তাহিক রেশন শুকনা খুবুজ, গামার, মধু আর খেজুর খাই। ভাবলেশহীন দুম্বার সঙ্গে অনুভূতিহীন জীবন কাটছিল এক রকম।
হঠাৎ করেই দ্বীপ শহর ফাইলাকা-য় আমার বদলি। ফাইলাকায় আমার মালিকের রয়েছে বিশাল ফার্ম। সঙ্গে বিলাস বহুল প্রাসাদ আর আধুনিক সব সুযোগ সুবিধা। প্রাসাদের মতো বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমাদের মতো তিন চারজন বাঙালির ওপর।
মালিক মাঝে মধ্যে আসেন। সঙ্গে থাকেন বিশাল পরিবারের সদস্য। কয়েকজন বন্ধু। চা, দুম্বার রোস্ট, মুরগির বিরিয়ানি খান, সারা দিন মাছ ধরেন সাগরের নীল পানিতে। সন্ধ্যায় দেওয়ানিতে বসে বিশাল বপু দুলিয়ে গল্প করেন। হাঃ হাঃ করে হাসেন। এভাবে দুই তিন দিন কাটিয়ে ফিরে যান কুয়েতে তার কর্মব্যস্ততার মাঝে। যাবার আগে আমাদের ছোট্ট করে বলে যান শুকরান। আমরাও আফওয়ান বলে তৃপ্তির ঢেকুর তুলি।
ইতোমধ্যে মালিকের পরিবারের সদস্যদের চিনে গেছি। জেনেছি বোরখায় ঢাকা তিন মহিলা মালিকের তিন স্ত্রী। তবে চেহারা দেখে নয়, কিছুটা বাহ্যিক সাইজ দেখে। কেননা মুখ দেখা হয়নি তখনো।

মালিকের এই ফাইলাকা আগমন উৎসবে আমি একজন নিষ্ঠাবান ফরাস। তাই রান্নার দায়িত্বে থাকা আলমচাচা মাঝে মধ্যে ডাক দেন তার সহযোগী হিসেবে। সে সময় মালিক অসুস্থতার কারণে নিজে আসেননি। তবে ছোট স্ত্রী, দুই পক্ষের পাচ ছয়জন ছেলেমেয়ে শ্রী লংকান দাসীসহ বিরাট বহর হাজির।

এবারও আলমচাচাকে সাহায্য করে চলেছি রান্না ধোয়া তদারকিতে। প্রতিবেলায় খাবার আগে পরে কুয়েতিদের পছন্দ লাল চা। দিনে কতোবার যে চা খায় তার হিসাব রাখা কঠিন।

ডাক আসলে প্রতিবার যত্ন করে চা খাইয়ে আসি। কিন্তু ছোট মালকিনের পছন্দ *চায়ে হালিব* অর্থাৎ *দুধ চা*। দুপুরের খাবার শেষে ডাক পড়ে চায়ে হালিবের। ট্রে সাজিয়ে ছোট মালকিনের কাছে হাজির হই। বোরখাহীন, জিন্স আর শাদা শার্ট পরা ছোট মালকিনের সৌন্দর্য বর্ণনা এই কলমের মোটা আচড়ে সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়-তৃতীয় দিনে আমার অন্দর মহলে চলাফেরায় জড়তা কেটে যায়। কারণ তাদের বার বার চায়ের চাহিদাই আমাকে অন্দর মহলের সহচর বানিয়ে তোলে।

বিকেলে দোতলায় চায়ে হালিবের ডাক পড়ে। ভীরু পায়ে হাজির হই দোতলার ফ্যামিলি কর্নারে।

ধবধবে শাদা সোফায় গা এলিয়ে মালকিন টিভি দেখছেন। মুচকি হেসে চা দিতে বলেন।

দামি কাপে চা ঢালতে থাকি আর মালকিনের সব প্রশ্নের ছোট করে জবাব দিই। দেশে কে আছে, কতো দূর পড়াশোনা করেছি, গাড়ি চালাতে জানি কি না ইত্যাদি। অনুভব করি এই পরমা সুন্দরী মহিলা অযথা হলেও কিছুটা আগ্রহী এই অধমের ব্যাপারে।

ওই দিন সন্ধ্যায় মহা আয়োজন। জ্যোৎস্নায় সাগরে মাছ ধরবে মালিকের ছেলেমেয়েরা। আলমচাচাও তাদের সঙ্গী। কারণ মাছ ধরে ওখানেই গৃল করে খাওয়া হবে। অভিজ্ঞতা থেকে জানি এই আসর শেষ হতে মাঝ রাত পেরিয়ে যাবে।

মালিকের স্ত্রী যাননি। তাই আলমচাচা বার বার তার রাতের মেনু, খাবার সময় স্মরণ করিয়ে দিয়ে যান আমাকে।

রাত নয়টার দিকে ডাক পড়ে দোতলায়। বিশাল ট্রে ভর্তি ধোয়া ওঠা খাবার নিয়ে হাজির হই মালকিনের খাস রুমে। ঘরের মৃদু আলো আর মিষ্টি সুবাস আমাকে যেন জাপটে ধরে।

কর্নার টেবিলে খাবার রেখে বের হতে যাই। মালকিন ছোট্ট করে জিজ্ঞাসা করে, সাগরে মাছ ধরেছো কখনো?

জবাবে না বলি।

পোলো খেলেছো?

উত্তর এবারও না।

বিয়ে করেছো?

জবাব না দিয়ে এক পলক তার দিকে তাকাই।

গোলাপি সাটিনের নাইটিতে সর্বাঙ্গ মুড়িয়ে আমার খুব কাছে দাড়িয়ে মুচকি হাসছেন আরব ললনা। চাহনিতে যা ছিল তা অনুবাদ করার সব শক্তি যেন আমার লোপ পেয়েছে।

মালকিন হাত বাড়িয়ে আমার দুই কাধে হাত রাখলেন।

আস্তে করে নিজের দিকে টেনে নিলেন।

নিজেকে ছাড়ার মৃদু চেষ্টা করি।

আকড়ে ধরেন মালকিন।

ভেঙে পড়তে থাকে আমার সব জড়তা। জেগে ওঠে আমার নিজেরই অচেনা এক মাতাল রূপ।

অনুভব করি একটি জীবন্ত, অথচ অতৃপ্ত শরীর চুষে নিতে চাইছে আমার সব উত্তাপ।

এক সময় ঝড় থামে। যেন জ্ঞান ফিরে পাই। লাফিয়ে উঠি বিধ্বস্ত বিছানা থেকে।

সারা শরীরে তৃপ্তি মাখানো মালকিন ছোট্ট করে আদেশ করেন, *আতেনি চায়ে হালিব।* অর্থাৎ আমাকে দুধ চা দাও।

দৌড়ে নেমে আসি স্বর্গের দোতলা থেকে, নিষিদ্ধ সুখের উপর তলা থেকে সিড়ি ভেঙে নিচ তলায় কেবল যেখানেই আমাকে মানায়।

কুয়েত থেকে

শেষ চুমুক

- আবিদ করিম মুন্না

কয়দিন থেকেই আচ করতে পেরেছিলাম ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে কিছু একটা ঘটবে। দুটি ছাত্র সংগঠনের নেতা–কর্মীরা একে অপরের প্রতি মারমুখী অবস্থা নিয়েছিল। যে কোনো মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও ভীতি ছড়িয়ে পড়ছিল।

আমার এক বন্ধু বললো, ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি খুব একটা সুবিধার নয়। চল, আপাতত ক্যাম্পাস ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই।

বন্ধুর কথায় প্রথমে গেলাম ময়মনসিংহ মেডিকাল কলেজ ক্যাম্পাসে। সেখানে বসেই বিকেলে খবর পেলাম ক্যাম্পাসের অবস্থা জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। রাত কাটালাম ময়মনসিংহ শহরের একটি আবাসিক হোটেলে। পরদিন বিকেলে আন্তঃনগর তিস্তা ধরে ঢাকা হয়ে সোজা নারায়ণগঞ্জ মামাবাড়ি। পরদিন নারায়ণগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরিতে জাতীয় পত্রিকার পাতায় চোখ বোলাতেই একটি শিরোনাম দেখে আতকে উঠলাম, *ময়মনসিংহে বাকৃবি ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসীদের গুলিতে দুই ছাত্র নিহত।*

চরম আতংক নিয়েই ফিরলাম বাকৃবি–তে দিন পাচেক পর। দুই দুটো মার্ডার হওয়ার পরও ইউনিভার্সিটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়নি সে সময়। কামাল এবং রঞ্জিত নামে দুইজন ছাত্র নিহত হয়েছে। ক্যাম্পাসের কো–অপারেটিভ মার্কেট (বর্তমানে যেটি কামাল রঞ্জিত মার্কেট)–এ পারতপক্ষে যেতেই চাইতাম না। তারপরও একদিন সন্ধ্যার আগে দুরু দুরু বক্ষে গেলাম। গিয়ে দেখলাম কো–অপারেটিভ মার্কেটের দক্ষিণ–পশ্চিম কোণে ইট দিয়ে একটা জায়গা ঘেরা, যেখানে তারা নিহত হয়েছিল।

পাচ বন্ধু এক সঙ্গে আবদুর রাজ্জাকের চায়ের স্টলে চা খেতে এসেছিল প্রতিদিনের মতো। কিন্তু ভাগ্য অনুকূলে ছিল না দুজনের। চায়ে চুমুক দেয়া অবস্থায় ঘাতকের বুলেট কেড়ে নিল তাদের তাজা প্রাণ।

কামালভাইয়ের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচয় ছিল। কারণ আমরা দুজনে ছিলাম রংপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের সাবেক ছাত্র। ভর্তি হয়ে বাকৃবিতে প্রথম যেদিন উঠেছিলাম আশরাফুল হক হলে, অনেকটা জোর করেই বিকেলে এক কাপ চা খাইয়েছিল।

তাদের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ যেখানে তারা নিহত হয়েছিল সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করেছে। এখনো সেখানে চায়ের স্টল আছে, আছে আগের মতোই ছেলেমেয়েদের আড্ডা।

সেদিন ঠিক ওই জায়গাতেই চা খেতে খেতে কি আলাপ করছিল – সমাজ, রাজনীতি নাকি নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। জানি না কোন কথোপকথনের মাঝখানে ঘাতকের বুলেট এসে বিদ্ধ করেছিল চা পানরত কামালভাই আর রঞ্জিতদাকে। তারা কি চায়ের শেষ চুমুকটুকু দিতে পেরেছিল?

সেন্ট্রাল রোড, রংপুর থেকে

akmunna23@yahoo.com

শ্রেষ্ঠ সময়

– স্বপন আজিজ

আমার মা সেকালের সব মায়েদের মতো তেমন কট্টরপন্থী ছিলেন না, তিনি আমাকে কৈশোরেই চা পানের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তবে দিনে মাত্র দুবার। সকালে এবং বিকেলে।

কৈশোরে আমার নানাবাড়িতে একান্নবর্তী পরিবারের চা পানটা যেন ছিল উৎসবের মতো। উত্তরবঙ্গের সেই নাটোর ছোট শহরের কথা মনে পড়ে। নাটোরের নানাবাড়িতে দুই তিনজন মাত্র শিশুকে বাদ দিয়ে সেই বিশাল একান্নবর্তী পরিবারের প্রায় বত্রিশজন নারী–পুরুষ ছিলেন চাপায়ী, এদের সবারই ছিল চা খাবার একান্ত নিজস্ব কাপ।

হ্যা, চা খাবার সময় নিজ নিজ কাপের বিষয়ে তারা সবাই ছিলেন ভীষণ রক্ষণশীল। কেউ কারো কাপে চা খেতেন না বা অন্যকে খেতে দিতেন না। তবে বাইরের অতিথিদের জন্য রিজার্ভ থাকতো আলাদা কিছু কাপ।

এখন মনে হয়, আমার কৈশোরে নানাবাড়িতে চায়ের এতো সুস্বাদের কারণ ছিল গরুর খাটি দুধ। তখন বাড়িতে প্রতিদিন যে তিন সের দুধ নেয়া হতো তার মধ্যে প্রায় অর্ধেক দুধ আলাদা করে রাখা হতো চায়ের জন্য। চায়ের সেই দুধকে অনেকক্ষণ ধরে ধীরে ধীরে জ্বাল দিয়ে ঘন করা হতো। ফলে সেই দুধে তৈরি চা ছিল অপূর্ব।

চা তৈরির ব্যাপারে আমার সেজখালার দক্ষতা ছিল একটু আলাদা ধরনের। অন্য কোনো খালা কিংবা মামিরা চা বানালে চা হতো মাঝারি মানের ভালো। কিন্তু যেদিন সেজখালা চা বানাতেন সেদিন চা হতো অপূর্ব সুস্বাদু। তাই আমাদের সবার দাবি ছিল, প্রতিদিন চা বানাতেই হবে সেজখালাকে।

আমাদের দাবি মেনে নিয়ে প্রায় প্রতিদিন বিকেলে তিনি চা বানাতেন। বিকেল চারটা থেকে তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যেতো।

বিশাল একটি ডেকচিতে চায়ের পানি ফোটানো হতো, চায়ের পানি ফোটানোর মধ্যে কোথায় যেন ভালো চা বানানোর একটি গোপন কৌশল লুকিয়ে আছে। সেজখালা যেন বুঝতে পারতেন অতি উৎকৃষ্ট মানের চা তৈরির জন্য পানি ঠিক কতোখানি গরম করতে হবে। পাশের অন্য একটি চুলায় অল্প আচে দুধ জ্বাল দেয়া হতো। খালা জানতেন, ঠিক কতোখানি দুধ ও চিনি মেলালে চা খেয়ে সবাই মুগ্ধ হয়ে যাবে।

নানাবাড়িতে প্রাত্যহিক সকালের নাশতার সঙ্গে চায়ের চেয়ে বিকেলের চা পর্বটিই ছিল বেশি আকর্ষণীয়। বিকেলে আমরা সবাই মনে মনে প্রস্তুত হতাম, কখন চা তৈরি হবে। বিকেলবেলায় আমরা সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির উঠানে কিংবা রান্নাঘরের বারান্দায় সমবেত হতাম।

চায়ের সঙ্গে বেশির ভাগ থাকতো মুড়ি কিংবা টোস্ট বিস্কিট। এখনো মনে আছে, আমরা কতো আনন্দ করে চা খেতাম। বিকেলের চা পর্ব যখন শেষ হতো তখন বাড়ির কাছে বাজারের সিনেমা হলের মাইকে গান শুরু হতো। প্রতিদিনই সিনেমার সান্ধ্য প্রদর্শনীর আগে গান বাজানো ছিল সেই আমলের মফস্বলী নিয়ম। কিন্তু সেদিনের সেই গানগুলো সুর ও বাণীর দিক ছিল অবিস্মরণীয়।

আমাদের বিকেলের চা পান শেষ হলেই সিনেমা হলের মাইকে বেজে উঠতো হয়তো হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, গীতা দত্ত, লতা মুঙ্গেশকর কিংবা অন্য কোনো বিখ্যাত শিল্পীর গান। হয়তো মাইকের অন্তরাল থেকে সেদিনের হেমন্ত গেয়ে উঠতেন, *তুমি এলে, অনেক দিনের পরে যেন বৃষ্টি এলো*। গীতা দত্ত গাইতেন, *নিশিরাত, বাঁকা চাঁদ আকাশে, চুপি চুপি বাঁশি বাজে বাতাসে*। কিংবা তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার অনবদ্য কণ্ঠে গাইতেন, *কাজল নদীর জলে, ভরা ঢেউ ছলছলে*।

তখন ছিল আধুনিক বাংলা মেলোডি গানের শ্রেষ্ঠ সময়। যেমন অসাধারণ কথা আর সেই সঙ্গে তেমনই অপূর্ব সুর। বাস্তবিকই আমাদের কৈশোরের চা পানের স্মৃতির সঙ্গে সেই গানের স্মৃতিও জড়িয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে।

তখন প্রতিটি রেল স্টেশনের চায়ের দোকানে খুব যত্ন করে চা বানানো হতো। মামারা গল্প করতেন, ঈশ্বরদীর চেয়ে তখন নাকি পোড়াদহ স্টেশনের চায়ের মান ছিল ভালো।

তখন স্টেশনে চায়ের দোকানগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা হতো কার চা অন্যের তুলনায় বেশি ভালো হবে! এখন যেন সেই প্রতিযোগিতার দিন শেষ হয়েছে।

তখন এই ভয়ংকর দুর্নীতির দিনে সর্বত্র শুরু হয়েছে ফাকির প্রতিযোগিতা, খারাপ চা পাতা আর খারাপ দুধ দিয়ে চা তৈরি হয় বেশির ভাগ দোকানে।

তবে ঢাকায় এখন বেশির ভাগ রেস্টুরেন্টে চায়ের স্বাদ মোটামুটি একই রকম, সেই কনডেন্সড মিল্ক এবং নিম্নমানের চায়ের গুড়ো অথবা টি ব্যাগ। এর মধ্যে কোনো বৈচিত্র বা নতুনত্ব নেই। আমার স্মৃতিতে রাজশাহীর সাবেহবাজারের পাকিস্তান পট্টির চায়ের স্বাদ খুবই সজীব হয়ে আছে। সত্তরের দশকে আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলাম। তখন প্রায়ই যেতাম শহরের সাহেববাজারে। *রহমানিয়া রেস্টুরেন্ট*–এর অপর দিকে রাস্তার ওপাশে ছিল অতি ঘিঞ্চি পাকিস্তান পট্টির গলি। মূলত এখনকার বেশির ভাগ বাসিন্দা ছিল অবাঙালি। তাই এমন অদ্ভুত নাম। তবে নাম যাই হোক, কয়েকটি খাবারের দোকানের জন্য সারা শহরে এই এলাকার খুব সুনাম ছিল।

বিকেল হতেই এ গলির কয়েকটি দোকানে তৈরি হতো পেয়াজু, বেগুনি, কলিজা সিঙারা, জিলাপি আর ছোলার ঘুগনি। প্রতিদিন বিকেল থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এখানেই ছিল ইউনিভার্সিটির ছাত্র ও শহরের নানান বয়সী মানুষের মিলন কেন্দ্র। তবে নানান ধরনের খাবারের পাশাপাশি সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল এখানকার *মালাই চা*। চিনি ও দুধের সর, চায়ের লিকারের সঙ্গে ঘন দুধ দিয়ে এ মালাই চা তৈরি হতো। রাজশাহীর সাহেববাজারের এ মালাই চায়ের স্বাদ এখনো নিশ্চয় আমার মতো আরো অনেকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

চায়ের স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে যেন কিছুটা বদলে যায়, আলাদা অনুভাবের সঞ্চার করে মনে। যেমন প্রচণ্ড গরমের দুপুরে চা পান করলে শরীরে গরমের অনুভূতি কিছুটা কমে যায়। আমরা যেন কিছুটা শীতলতার স্পর্শ পাই। আবার রিমঝিম বরষার অলস বিকেলে চা খেলে বেশ চাঙ্গাবোধ হয়। তেমনই মাঘ মাসের শীতের সকালে চা পান করে দেহে এক ধরনের উষ্ণতার স্পর্শ অনুভব করা যায়। তাই চা এক অনন্য পানীয়, এর সঙ্গে অন্য কোনো পানীয়ের তুলনা চলে না। ছেলেবেলায় কোনো কোনো রেল স্টেশনে দেখেছি লেখা আছে, *ইহাতে নাহি কোনো মাদকতা দোষ, পানে করে চিত্ত পরিতোষ*।

একদিন পরে এই কথাটির বাস্তবতা গভীরভাবে অনুভব করি।

চা পানের সঙ্গে যে কতো স্মৃতি জড়িয়ে আছে তা বলে শেষ করা যাবে না। এ ধরনের একটি স্মতির কথা বলে আমার এ রচনার শেষ টানবো।

আমার শৈশবে কোনো কোনো রেল স্টেশনে মাটির ভাড়ে চা বিক্রি হতো। আমার তখন পাচ ছয় বছর বয়স। পঞ্চাশ দশকের একেবারে শেষ দিকে বাবা মায়ের সঙ্গে যাচ্ছি উত্তরবঙ্গের নাটোর থেকে চট্টগ্রাম। সেই আমলে দুই দিনের রেলযাত্রা। সেই রেলযাত্রার সময় শীতের শেষ রাতে লাকসাম জাংশনে মাটির ভাড়ে চা নিয়ে কারা যেন ডাক দিয়েছিল, *চা চা, গরম চা*।

শীতের শেষ রাতে কুয়াশার মধ্যে এমন ডাক আর কখনো শুনিনি। সেই ভাড়ের গরম চায়ের স্বাদ এখনো যেন জিভে লেগে আছে অমৃতের মতো।

তাই মনে হয় চায়ের স্বাদ ঘরে এক রকম আর বাইরে অন্য রকম। এবং সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চায়ের স্বাদও যেন অনেক বদলে যায়।

যাত্রাবাড়ী, ঢাকা থেকে

থুতু

– ইরশাদ মিয়াদাদ

আমাদের গ্রাম্য হাটে (রামদাশ হাট) চায়ের দোকান বয়দের সঙ্গে আমার কম বেশি সখ্য আছে। শুনেছি তারা নাকি অনেক লোককে থুতু খাইয়েছে। কারণ কাস্টমাররা তাদের নিয়ে অভিযোগ করেছিল হোটেল মালিককে। আমাদের পেছন দিকে বসতে হয় বা যেখানে চা বানায়ই সেখানে দাড়িয়ে দাড়িয়ে খেতে হয়। তেমনি একদিন দোকানে দাড়িয়ে চা খাচ্ছি, তখন সামনে থেকে একজন ডাক দিল,... পুত এগুলো কি চা বানিয়েছিস?

তখনই দেখলাম আসল কাণ্ড। কাপে থুতু বললে ভুল হবে,... তাতে ভালো করে কনডেন্সড মিল্ক দিয়ে তাকে দিল।

সে খেয়ে খুশি হয়ে চলে গেল।

বাশখালী, চট্টগ্রাম থেকে

অন্য রকম চা

– মোহাম্মদ তোজাম্মেল হক

আমি যদিও বড় হয়েছি গ্রামে তবুও চা পানের বিষয়টা ছোটবেলা থেকেই জানা ছিল। সেই জানাটাও একটু অন্য রকম।

একদিন দেখতে পাই, দাদুভাইকে কাপে করে লাল চা দিচ্ছেন আমার মা।

মাকে বললাম, মা, তুমি প্রতিদিন দাদুভাইকে কাপে করে কি দাও? আমিও খাবো।

মা বললেন, ওসব ছোট মানুষকে খেতে হয় না।

চা তৈরির পর কেটলিতে চা পাতার তলানিসহ একটুখানি লাল পানি থাকতো।

একদিন মাকে চোখে চোখে রাখা শুরু করলাম কখন দাদুভাইকে চা দেয়া হবে, তারপর সুযোগ বুঝে অবশিষ্ট লাল পানিটুকু খাবো।

যেমন বুদ্ধি তেমন কাজ। মায়ের চোখকে ফাকি দিয়ে একদিন ওই লাল পানিটুকু খেলাম। আর তখনি আমার সমস্ত মুখে যেন ভাজ পড়ে গেল।

এ আমি কি খেলাম! সেই ছোটবেলায় নিজের কান নিজেই ধরে ওয়াদা করেছি আর কোনোদিন চা খাবো না।

লাভলী, লাকী, ফজলু, জব্বার আমরা সবাই সমবয়সী। সবাই একই ক্লাসে পড়ি। ক্লাস ওয়ান কি টু–তে হবে। স্কুল ছুটি হতো দুপুর বারোটায়। আমাদের সবার বাড়ি ও স্কুল দুই–ই ছিল নদীর ধারে। তাই স্কুল ছুটির পর দুপুরে হই হুল্লোড় করে নদীতে লাফ–ঝাপ দিয়ে গোসল সেরে বাড়িতে গিয়ে মায়ের মুখের দুই চারটে বকুনি জুটতো।

এরপর দুপুর গড়িয়ে যখন বিকেল হতো তখন শুরু করতাম খেলাধুলার পালা। আমরা কয়েকজন ছিলাম খুবই ছোট মানুষ, ফলে বড়রা আমাদেরকে খেলায় নিতো না। তখন আমরা ছোটরা খেলনাপাতি দিয়ে এক রঙের খেলায় মেতে উঠলাম। কয়েকটা পাটখড়ি নিয়ে এলাম। কেউ কলাপাতা সংগ্রহ করতে গেল। কোনো কোনো মেয়েরা কলাগাছের ছালি দিয়ে শাড়ি বানিয়ে বৌ সাজলো। কেউ খেলনাপাতি নিয়ে এলো।

সবাই মিলে মাটি খুড়ে পাটখড়ি দিয়ে খুটি তৈরি করে মাটিতে পুতলাম। কলাপাতা দিয়ে খেলা ঘরের ছাউনি দিলাম। বেড়া দিলাম। তারপর সেই খেলাঘরের ভেতর সবাই সারিবদ্ধভাবে বসলাম।

এবার রান্নার পালা।

সবাই বললো, প্রথমে চা হবে, তারপর অন্যান্য।

সবাই মিলে লাকীকে ধরলাম, তুমি ভালো চা তৈরি করতে পারো। তাই তোমাকেই চা তৈরি করতে হবে।

লাকী তাই করলো। ছোট একটা খেলনাপাতি ভরে পুকুর থেকে পানি নিয়ে আসা হলো। সেই পানিতে ইটের গুড়া ও বালু হচ্ছে চিনি। মিথ্যা একটি চুলায় রাখার পর ওসব চা হিসেবে পরিবেশন করা হলো। মিথ্যা কাপে মিথ্যা চা এ যেন এক সত্য চুমুক।

অনেকেই বলাবলি করলো, লাকী, তোমার হাতের চা তো, তাই বেশি মজা।

সেই ছোটবেলার মিথ্যা চায়ের কথা মনে পড়লে আজো ছোটবেলায় ফিরে যেতে ইচ্ছা করে।

এরপর আস্তে আস্তে যখন বড় হয়েছি তখনো দেখেছি চা তৈরির এক অন্য রকম ঘটনা।

গ্রামে যখন ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের সময় হতো তখন প্রত্যেকটি ওয়ার্ড কমিশনার এবং চেয়ারম্যান প্রার্থীদের বাড়িতে চা পানের ধুম পড়ে যেতো।

একদিন আমরা কয়েকজন ছেলে মিলে পরামর্শ করলাম, আজ সন্ধ্যায় পড়ায় ফাকি দিয়ে কমিশনার প্রার্থীর বাড়িতে যাবো চা খেতে।

দুই তিনজন মিলে আলাপ করলাম, তুমি জব্বারকে বলবে, জব্বার মিলুকে বলবে, মিলু আবার টুনকুকে বলবে। এভাবে পনেরো বিশজন ছেলেকে বলাবলি করা হলো।

আমাদের গ্রামের রাস্তার মোড়ে একটা বিরাট জামগাছ ছিল। সেই গাছের নিচে জামায়েত হতে হবে সবাইকে। কথা মতো তাই হলো। সন্ধ্যা ছয়টায় সবাই হাজির হলাম জামগাছের তলায়। ওখান থেকে শ্লোগান দেয়া শুরু করলাম, *যদু ভাইয়ের চরিত্র, ফুলের মতো পবিত্র। যদু ভাইয়ের মার্কা, কদু মার্কা।*

মিছিল করতে করতে শেষমেশ কমিশনার প্রার্থী যদু ব্যাপারীর বাড়ির আঙ্গিনায় গিয়ে হাজির হলাম।

বাড়ির ভেতর থেকে দুজন লোক বেরিয়ে এলো। আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হলো তোমরা সারি করে বসো। তোমাদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করছি।

বাড়ির আঙ্গিনায় ধানের খড় বিছিয়ে দেয়া হলো।

আমরা সবাই খড়ের ওপর লাইন করে বসলাম।

প্রথমে আমাদেরকে মুড়ি এবং চালের পায়েস খেতে দেয়া হলো। আরো বলা হলো, *ছেলেপেলে, তোমরা কেউ উঠবে না, তোমাদের জন্য আজ অন্য রকম চা হচ্ছে।*

আমার পাশের বন্ধু মিলুর শরীর স্পর্শ করে বললাম, তুই আমার জায়গাটা একটু দেখিস, আমি দেখে আসবো।

মিলু বললো, কি দেখতে যাবি?

বললাম, কিভাবে অন্য রকম চা রান্না হচ্ছে তাই দেখবো।

চুপিচুপি রান্নাঘরে ঢুকলাম। দেখলাম বড় বড় সিলভারের পাতিলে শুধু পানি গরম করা হচ্ছে আর সেই পানিতে কিছু গুড় মেশানো হচ্ছে। পানির সঙ্গে গুড় মিশ্রিত হয়ে গেলে সেগুলো চা হিসেবে পরিবেশন করা হচ্ছে। আর বলা হচ্ছে, *এক কাপ চা নিন, কদু মার্কায় ভোট দিন।*

সেদিনকার সেই চা পাতা ছাড়া শুধু পানি এবং গুড় মেশানো লাল চা খাবার জন্য কতো যে লাফালাফি, চিল্লাচিল্লি করেছি তা আজো মনে পড়ে।

বন্দর, চট্টগ্রাম থেকে

লাল নীল বেগুনি

- খালেদা পারভীন মুন্নী

তখন ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্রী। ১৯৮৭ সালের কথা। সে আমাকে পছন্দ করতো, আমিও তাকে পছন্দ করতাম। সে মাঝে মধ্যে বাবার কাছে আমাদের বাসায় আসতো। সে যখন ঘরে আসতো, আমার হাটাচলা বন্ধ হয়ে যেতো। বুক দুরু দুরু করতো। কি করবো না করবো বুঝে উঠতে পারতাম না।

এরই মাঝে মা বলে উঠতেন, যা তো, রূপকের জন্য চা করে নিয়ে আয়।

আমার তখন যা–তা অবস্থা!

বাবা, মা তার সঙ্গে বসে গল্প করতেন। আর আমি বেচারা লজ্জায় লাল, নীল, বেগুনি হতে হতে ডালের কড়াইয়ে চায়ের পানি ফুটিয়ে তাতে কিছু চাপাতা দিয়ে দুধ, চিনি মিশিয়ে, হাত পুড়িয়ে, ঘাম ঝরিয়ে, হাটু কাপিয়ে, কাপ–পিরিচ নিয়ে টলতে টলতে তার সামনে চা (?) নিয়ে হাজির হতাম। কপাল দোষে কখনো কখনো অধিক কাপাকাপির ফলে কাপ থেকে পিরিচে, পিরিচ থেকে ট্রেতে সাপ্লাই হয়ে যেতো।

তখন সে পদার্থ মুখে নিয়ে কৃত্রিম হাসি ঠোটে ঝুলিয়ে তিনি ব্যঙ্গ করে বলতেন, বাহ! তনিমা, তো খুব ভালো চা করতে পারে!

আমার তখন *ছেড়ে দে মা কেদে বাচি* অবস্থা। তার সামনে থেকে পালাতে পালাতে ভাবি, এরপর বাছাধন যখন আবার আসবে তখন এমন চা করে খাওয়াবো যে, একেবারে বাপের নাম ভুলে যাবে। কিন্তু ঘটনা হতো উল্টো। প্রতিবারই যখন সে আসতো, আমার কাপাকাপি এতো বেড়ে যেতো, একটা না একটা অঘটন ঘটেই যেতো। এর সঙ্গে যোগ হতো হয় কাপ ভেঙে যাওয়া, নয়তো পিরিচ পড়ে যাওয়া কিংবা অন্য বোনাস মায়ের বকুনি।

আমি যে একেবারে ভালো চা করতে পারতাম না তা নয়। অন্য সময় চা করলে এমন হতো না। শুধু সে এলেই আমার হৃদকম্পন শুরু হয়ে যেতো।

শেষে ও ঘরে এলেই মিষ্টি হেসে মাকে বলতো, কাকিমা, আমি এই মাত্র চা খেয়ে এসেছি।

মা বলতেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে।

আমিই শুধু বুঝতাম এই হাসির মর্মার্থ।

আজ অনেক দিন পর এখন খুব ভালো চা বানাই। অন্তত সবাই তা বলে। তাতে কি! প্রকৃতির খেয়ালে তার আর আমার মাঝে অনেক দূরত্ব। চা খাওয়ানো তো দূরের কথা, দেখাও হয় কালে ভদ্রে।

তাই চা নিয়ে সামনে বসলেই কিংবা চা বানাতে গিয়ে তার সেই ব্যঙ্গ হাসি, কটাক্ষ করা বিদ্রূপ মনে পড়ে যায়। ক্ষণিকের জন্য আনমনা হলেও পরক্ষণেই বাস্তবে ফিরে আসি। কারণ জীবন তো এমনই!

মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী থেকে

লোভ

– মন্টু চৌধুরী

১৯৫৮ সালের কথা। তখন স্কুলে যাওয়ার জন্য বায়না ধরেছি। আমার খেলার সঙ্গী নূর বানু আমার সঙ্গে থাকে। সকাল–দুপুর–সন্ধ্যা খুনসুটি করে, চিমটি কাটে, দাদির কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করে। পেয়ারা, কুল পেপে ইত্যাদি পেড়ে দেয়ার জন্য আবদার করে। আমার এগুলো মোটেই ভালো লাগে না। না দিলে খামচি মেরে মেরে ক্ষতবিক্ষত করে ছাড়ে।

খামচি, চিমটি, চেচামেচি, কান্নাকাটির অত্যাচারে দাদি একদিন আমার ছোট চাচাকে ডেকে বললেন, পাজি দুটোকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে আয়। সারা দিন পিছু পিছু ঘুর ঘুর করে জ্বালিয়ে মারে।

ভাগ্যিস! তখনো পানিতে নামা শিখিনি। শিখলে হয়তো আমাদের জন্য ঘোড়া তৈরির নির্দেশ দিতেন।

স্কুলের সামনে বাজার, বাজারে সিরাজ মিয়ার একমাত্র চায়ের দোকান।

চাচা আমাদের দুজনের হাতে দুটি লাঠি বিস্কিট ধরিয়ে দিয়ে চায়ের অর্ডার দিলেন।

ভাবলাম আমাদেরও দেবেন। ছোট কাচের গ্লাসে দুধ দিয়ে ছাকনিতে পাতার গুড়ো দিয়ে গরম পানি ঢালতেই খয়েরি রঙের রঙ চা বেরিয়ে এলো। জীবনের প্রথমবারের মতো চা দেখলাম। লোভে জিভে পানি এসে গেল। নূর বানুর দেখলাম চোখ দুটো বড় হয়ে গেছে। লোভের স্বরূপ যে কেমন নূর বানুর সেই চকচকে চোখের চাহনি কল্পনা করে এখন বুঝতে পারি। দেড় চামচ লাল চিনি দিয়ে সিরাজ মিয়া ঘুটে দিলেন চাচার হাতে।

চাচার কানে কানে চা খাওয়ার কথা বললে ধমক দিয়ে উঠলেন তিনি।

সঙ্গে বসা অন্য লোকজন উপদেশ দিলেন, ছোটদের চা খেতে নেই।

কিন্তু আমরা নাছোড়বান্দা। মনে মনে জিদ করে বসলাম লাল চিনির দুধ চা আমরা খাবোই। পরদিন দাদির আচল ধরে আবদার করি। খুনসুটি করে অবশেষে অকারণে কেদেকেটে দুই আনা পয়সা হাতিয়ে নিলাম। বিকেলবেলা গিয়ে বসলাম সিরাজ মিয়ার দোকানে। বললাম, দুই কাপ দুধ চা দিতে।

সিরাজ মিয়া চোখ বড় করে জিজ্ঞাসা করলো, চা দেবো?

বললাম, হ্যা।

পয়সা এনেছিস।

হ্যা।

তবে দে।

দুই আনা পয়সা তার হাতে তুলে দিয়ে আয়েশ করে খাটিয়ার ওপরে বসলাম।

সিরাজ মিয়া দুই বস্তা চানাচুর (বস্তার মতো লম্বা ছোট প্যাকেট) আমাদের দিকে ছুড়ে ফিরে বললেন, যা ভাগ!

আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সিরাজ মিয়ার দিকে চার হাতের খামচি শাসিয়ে বাড়িতে ফিরে এলাম। দাদির আচল ধরে তার পিছু পিছু ঘুর ঘুর করলাম। সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে পড়লাম দুজনে।

দেশে তখন চলছিল মৌলিক গণতন্ত্রের জোয়ার। আমাদের ইউনিয়নের মেম্বার চেয়ারম্যান ইলেকশন। তখন জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতো মেম্বার। মেম্বারদের ভোটে চেয়ারম্যান। স্কুল মাঠে মেম্বার নির্বাচনে চাচার সঙ্গে আমি আর নূর বানু গিয়েছি। মাঠের চারদিকে টিনের ছাপড়া করে অস্থায়ী দোকান বসিয়েছে। কোনো দোকানে জিলাপি, কোনো দোকানে হরেক রকম মিঠাই– মন্ডা, কোনো দোকানে বাতাসা, গজা, বাদাম, চানাচুর। কিন্তু কোনো দোকানই আমাদের আকর্ষণ করলো না। কারণ একটাই। চা খাবো। লাল চিনির দুধ চা আমাদের দুজনের কাছে যে কি লোভনীয় জিনিস তা ওই সময়ের ওই বয়সের শিশু–কিশোরের মন ছাড়া বোঝানো যাবে না।

একজন মেম্বার পদপ্রার্থী আদর করে আমার আর নূর বানুকে ডেকে নিয়ে বসালো সিরাজ মিয়ার দোকানে।

ভাবলাম এবার বুঝি চা খাওয়া হবে। কিন্তু না, হলো না।

দুটো লাল রঙের কাঠি লজেন্স ও দুই বস্তা চানাচুর দিতে বললেন তিনি।

নূর বানুর দিকে তাকিয়ে সাহস নিয়ে বললাম, চাচা, আমরা চা খাবো।

তিনি সিরাজ মিয়াকে বললেন, আমাদের দুজনকে দুই গ্লাস দুধ দিতে।

এরপরের ঘটনা আরো চমকপ্রদ। মায়ের সঙ্গে গিয়েছি নানাবাড়ি। নূর বানুও আমার সঙ্গে আছে। নূর বানু আমার ফুপুর মেয়ে। আমার ফুপু মরার পর সে আমাদের বাড়িতে থাকে। আমাদের পরিবারের সবাই তাকে

নিজের সন্তানের মতোই ভালোবাসেন। আমার ওপর তার অসম্ভব রকমের টান। আমাকে ছাড়া কোথাও একা থাকতে পারে না সে।

বছরের নির্দিষ্ট একটা দিনে আমার নানাবাড়িতে ঘটা করে গরু জবাই করে ওয়াজ মাহফিল হতো। দূর-দূরান্ত থেকে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা শুনতে আসতো সে ওয়াজ। দেশের এবং ইনডিয়ার ফুরফুরা শরীফের পীর বংশের আলেমরা আসতেন ওয়াজ করতে। এবারেও এসেছেন অনেক নামি-দামি মওলানারা। বিকেল থেকে শুরু হবে মাহফিল, শেষ হবে মধ্য রাতে। শ্রোতারা ওয়াজ শেষে খাওয়া-দাওয়া করে বাড়ি ফিরে যাবে।

আমরা মাদুর বিছিয়ে ওয়াজ শুনছি।

তখন সন্ধ্যা হতে একটু বাকি আছে। একদল স্বেচ্ছাসেবক মামা হ্যাজাক লাইট ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বাড়ির মেয়েরা নিজ নিজ কাজ গুছিয়ে ওয়াজ শোনার প্রস্তুতি নিচ্ছে। গরু- ছাগল, হাস-মুরগি তাদের নিজের ঘরের আশপাশে ঘোরাঘুরি করছে। এমন এক গোধূলি সময়ে আমার মামারা কয়েকজনে মিলে মওলানাদের জন্য চা নিয়ে এলেন। শহরে থাকা আমার বড় মামা বিশেষ কায়দায় বানিয়েছেন চা।

আমি আর নূর বানু উঠে গেলাম বড় মামা যেখানে চা বানাচ্ছেন। মামার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফরমায়েশ খাটতে ব্যর্থ হলাম।

ধমক খেলাম ছোট খালার।

দুটি বিস্কিট হাতে দিয়ে ওয়াজ শোনার পরামর্শ দিয়ে চলে গেলেন মামা ও ছোট খালা।

আমি আর নূর বানু আশপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে চুপি চুপি চেক করলাম কেটলি। কিন্তু হায়! কেৎলিতে কিছুই নেই। কি করি কি করি করতে করতে দেখলাম, একজন মামা মওলানাদের চা খাওয়া খালি গ্লাসগুলো ফেরত নিয়ে আসছে। আমরা সরে দাড়ালাম আবডালে। মামা গ্লাস ভর্তি ট্রেটা টেবিলের ওপর রেখে চলে গেলেন।

দুনিয়ার ক্ষোভ এসে ভর করলো আমাদের ওপর। লাল চিনির দুধ চা খাওয়ার সুপ্ত বাসনা জেগে উঠলো মনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নেমে আসবে সন্ধ্যা। মসজিদে মসজিদে মুয়াজ্জিনের আজানের সুরে মোহিত হয়ে যাবে প্রকৃতি। গোধূলির ধূসর রঙের সঙ্গে মিশে যাবে নামাজিদের সূরা-কেরাতের সুর। সভাস্থলে হ্যাজাক লাইটের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে যাবে দর্শক-শ্রোতাদের মুখ।

নূর বানু ও আমি। আমরা দুটি কৌতূহলী কিশোর-কিশোরী চলে এলাম গ্লাস ভরা টেবিলের সামনে। দেখলাম প্রত্যেকটা গ্লাসের তলে একটু করে তলানি আছে। চা খাওয়ার এটাই বোধহয় বড় সুযোগ। আশপাশের কেউ আমাদের লক্ষ্য করছে না। সবাই মওলানার ওয়াজ শোনায় মশগুল।

সবগুলো গ্লাসের তলানিটুকু ঢেলে নিলাম দুটি গ্লাসে। খয়েরি রঙের ঠাণ্ডা চা, দুটি গ্লাস থেকে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। দেরি না করে দুজনে গ্লাস তুলে নিলাম হাতে। চুমুক লাগালাম এক গ্লাসে।

সঙ্গে সঙ্গে মাথার পেছন থেকে কে যেন চুল ধরে চড় মারলো গালে। ঠাস করে হাতের গ্লাস মাটিতে পড়ে গেল। ঠাণ্ডা চা পায়ে পড়লে তাকিয়ে দেখি মা আমার চুল ধরে চড় মারছেন। চোখ বড় করে *চা গিলা রাক্ষস* বলে পরিচিতি পেলাম মায়ের কাছ থেকে। ব্যথার জ্বালায় গাল মুখ জ্বলে যাচ্ছে। কিন্তু জোরে কাদতে পারলাম না লোকে জেনে ফেলবে বলে।

চাচড়া, যশোর থেকে

ঝড়

- মীর মহব্বত আলী লিটন

মদখোর, নেশাখোর, জুয়াখোরের মতো তার ধারণায় আমরা *চাখোর* বংশের লোক। ভাত না খেয়ে নিত্যদিন নাকি আমাদের শুধু চা হলেই চলে যাবে। চা ছাড়া এক মুহূর্তও চলবে না। আসলেই হয়তো তাই।

সকালে সবার নাশতার পর চা পর্ব শেষ হয়ে গেলে পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনে হাতের কাছেই যাতে চা পেতে পারি সে জন্য চা তৈরি করে ফ্লাস্ক ভর্তি করে রাখা হয়। সেটা শেষ হয়ে গেলে আবার, আবার এবং আবার। এভাবেই চলে ঘুমানোর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিদিন। আশপাশের মানুষের কাছে এ জন্য আমাদের কতো সুনাম, চাখোর আর কাকে বলে!

ও চা খায় না সে জন্য আমার কোনো আক্ষেপ কিংবা তাগিদ নেই তার প্রতি। প্রতিটি মানুষেরই নিজস্ব একটা পছন্দ-অপছন্দের জগৎ থাকবে এটাই স্বাভাবিক এবং সেখানে হস্তক্ষেপ করতে যাওয়াটা অনুচিত বলেই আমার ধারণা। কিন্তু আমার বেলায় তার যা মনে হয় তা হচ্ছে, কি আছে ওই গরম পানিতে? যা না হলেই তোমার চলে না। কতোভাবে তোমাকে বলছি, অথচ তুমি তা ছেড়ে দিচ্ছো না। কেন শুনি তো?

তাকে বোঝাতে পারি না গরম পানিতে আসলেই যে কি আছে! স্বাভাবিকভাবে বলি, অভ্যাস হয়ে গেছে তো, সেই শিশুবেলা থেকেই অভ্যাস।

ক্ষেপে ওঠে ও আমার ওপর। সেই বয়সে মায়ের বুকের দুধও তো অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, সেটা ছেড়েছো কিভাবে? আজও তা ধরে রাখোনি কেন?

শান্তভাবে বলি, আচ্ছা, একই প্রসঙ্গে অহরহ তোমার এমন আচরণ কতোক্ষণ সহ্য হয় বলো? সামান্য চা নিয়ে তোমার এমন আচরণ সত্যিই এখন অসহ্য লাগে।

চুপ, একদম চুপ। তোমাকে অনেকবার বলেছি এবং অনেক সংযত ভাবে বলেছি। শোনো! আজই তোমার সঙ্গে আমার শেষবার। চা খেলে আমাকে আর স্পর্শ করবে না। বদ কোথাকার।

আকাশ আমার মাথায় ভেঙে পড়ে। কি কথায় কি কথা বলে ফেললো এই মেয়ে! জেদ চাপে মনে। চায়ের মাত্রা বাড়িয়ে দেই। ওকে স্পর্শ করি না। দুজনেরই মন বিষণ্ন থাকে। ওরটা অনুভব করতে আমার ভালোই লাগে। আমরা খুব সুখে আছি এটা বোঝাতে অন্য সবার সামনে খুব হাসি-খুশিভাবেই কথা বলি তার সঙ্গে।

না দিলেই নয়, এমন দুই একটি কথার উত্তর ও খুব স্বাভাবিকভাবেই দেয়। বেশির ভাগই সযত্নে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে।

একদিন সকালে নাশতার পর চা খাওয়ার সময় আদরের পাপার মুখেও একটুখানি চা দিই। পাপা চুকচুক করে চুষতে থাকে।

সে কোথা থেকে ঝড়ের বেগে এসে কোল থেকে পাপাকে ছিনিয়ে নিয়ে হাত থেকে চায়ের কাপটি কেড়ে নিয়ে যায়।

সেটাকে তুলে এনে ঝনঝন শব্দে চুরমার করে ফেলি।

নির্বাক তাকিয়ে থাকে ও ভগ্নাংশগুলোর দিকে।

স্থান ত্যাগ করি।

মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হওয়ার থিওরির মতো *কষ্টে কষ্টে আনন্দ* আমাদের মাঝে তৈরি হয় না। সামান্য একটা বিষয়কে ওর এমনভাবে বড় করে নেয়াকে কেন্দ্র করে এখন আমরা খাটের দুই প্রান্তে উল্টোমুখী নির্ঘুম রাত কাটাই।

ঘরে আর এখন চা খাই না। বিকেল হলেই চলে যাই বাজারে। এক সঙ্গে দুই কাপ শেষ করে ঘরে ফিরি। আস্তে আস্তে আমার প্রতি তার আচরণে কেমন একটু নমনীয়তা, কমনীয়তা অনুভব করি। হয়তো ও বুঝতে পারে আগুন উসকিয়ে দিলে তাতে পুড়ে যাবার ভয় আছে কিংবা আজ বাজারে গিয়ে আড্ডা মেরে চা খাচ্ছি, কাল হয়তো আড্ডার আলোচনায় অন্য কিছুও আসতে পারে।

কখনোই তার কাছাকাছিতে ধূমপান করি না। ধূমপান তার পছন্দ নয়। একদিন বাজার থেকে বাড়িতে ফিরেই ইচ্ছাকৃত তাকে দেখিয়েই সিগারেট ধরিয়ে কঠিনভাবে টানতে শুরু করি।

সে অবাক হয়ে ধোয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে আপন মনেই শুনিয়ে বলে, বাজারের চা কি আজকাল কড়া হয়ে গেল নাকি!

সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে মাটিতে ছুড়ে ফেলে বলি, শালার সিগারেটেও কাজ হচ্ছে না দেখছি!

একে তো রাত তার উপর মুষলধারে বৃষ্টি। ঢাকা থেকে ঘরে ফিরেছি কাকভেজা হয়ে। শীতে কাপুনির মতো হচ্ছে। ভেজা কাপড় পাল্টিয়ে কোনো কথা না বলে কাথামুড়ি দিয়ে পাপার পাশেই শুয়ে পড়ি। টিনের চালে জোর বৃষ্টি পড়ার শব্দ মনটাকে উন্মনা করে তোলে। একটু পর স্টোভ জ্বালানোর খুটখাট আওয়াজে বিরক্তি ভরা কণ্ঠে উদ্দেশ্যহীন জানতে চাই, কিসের এতো খুটখাট?

ও ঠাণ্ডাভাবে জবাব দেয়, চেচিও না, বাবুর দুধ গরম করছি।

সব কিছু গুছিয়ে এনে ও আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে, নাও!

নাও–র অর্থ হচ্ছে, ও সব কিছু তৈরি করে দিলেও পাপাকে দুধ খাওয়ানোর পর্বটা আমিই সম্পন্ন করি। দ্বিরুক্তি না করে উঠে বসে সামনে হাত বাড়িয়েই টাসকি খেয়ে যাই। তার হাতে দুধ নয়, পিরিচের ওপর কাপের মধ্যে চা।

বলি, এটা কি!

ও দুষ্টুমির হাসিতে জবাব দেয়, এটা হচ্ছে পাপার বাবার চা।

শুনে আকাশ আমার মাথায় ভেঙে পড়ে না। কি যে হয় আমার! বলি, আগে তুমি একটু খেয়ে দিলে নিতে পারি।

ও কাপের দিকে না তাকিয়ে আমার দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে চায়ে চুমুক দেয়।

ঘরের ভেতরটা হঠাৎই যেন আলোকিত হয়ে ওঠে। মনের কোথাও আমার এতোটুকু মেঘ জমে থাকে না। বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি আমার শ্রদ্ধার মায়ার ভালোবাসার একমাত্র মানুষটির দিকে। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে। কেটে যায় অনেক দিন পর আমাদের একটি সুন্দর রাত, সুন্দরতম রাত।

ষোলঘর, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ থেকে

বণিক

- মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মুমিন

কিছুদিন আগের ঘটনা। এক জোড়া কানের দুল তৈরি করার জন্য বণিকের কাছে গিয়েছিলাম। বণিক আমাদের পরিচিত হওয়ায় নিশ্চিন্তে অর্ডার দিয়ে চলে এসেছি। তিন দিন পরে দুল নিতে এসে জিজ্ঞাসা করাতেই বললো, আর অল্পকিছু কাজ বাকি রয়েছে, একটু বসুন। এখনই দিয়ে দিচ্ছি, চা খান।

দুই কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে কাজে মগ্ন হলো।

দেখলাম সে একটা হাতল বিহীন পুরনো কাপে বোতল থেকে স্পিরিট জাতীয় কিছু একটা ঢাললো, একটু পর পর দুল জোড়া কাপের ওই তরল পদার্থে ডোবালো আর ঘষলো।

এরই মধ্যে পিচ্চি ছেলেটা দুই কাপ চা নিয়ে এলো। পিরিচ ছাড়া একটা কাপ আমার হাতে এবং অপরটি ওই স্পিরিট ভর্তি কাপের পাশে রেখে চলে গেল।

বণিক লোকটা চায়ের কাপের দিকে দৃষ্টি না দিয়েই এক হাতে চায়ের কাপ টেনে এক চুমুক দিয়ে রেখে দিচ্ছে। আবার গভীর মনোযোগে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কোনো কথা নেই, শব্দ নেই, গভীর ধ্যানে সে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

আমিও তেমন কোনো কথাবার্তা বলছি না এই ভেবে, পাছে না আবার দুল জোড়ার সৌন্দর্যে ব্যাঘাত ঘটে! এই যখন ভাবছি তখন হঠাৎ একটা চিৎকারের শব্দে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তাকিয়ে দেখি বণিক বেচারা যন্ত্রণায়

কাতরাচ্ছে এবং স্পিরিট ভর্তি কাপটি হাত থেকে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে জিভ ও ঠোট দুটো পুড়ে কালো হয়ে গেছে। ঠোট ও গাল ফুলে উঠেছে।

সবাই বলছে কি হয়েছে?

বেচারা প্রচণ্ড জ্বালা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, ছটফট করছে। কোনো কথাই বলতে পারছে না।

ঘটনা হচ্ছে, সে চায়ের কাপের দিকে না তাকিয়ে চা পান করছিল। তাই হঠাৎ স্পিরিট ভর্তি কাপটা ভুলে চা মনে করে মুখে নেয়াতেই এই মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছে।

জগৎপুর, হবিগঞ্জ থেকে

সেই আড্ডা

- মোহাম্মদ আলমগীর লাবু

মার্কেটে দেখা হয়ে গেল সীমা ও সাদিকের সঙ্গে। বহুদিন পর তাদের সঙ্গে দেখা।

দেখা হওয়ার পর কেমন আছিস? আসিস না কেন? ইত্যাদি খেজুড়ে আলাপ।

ইচ্ছা করেই তাদের কাছে যাই না। তবুও মুখে বলি, ঠিক আছে, যাবো।

নানান কথার পর বিদায়বেলা সাদিক বললো, বাসায় আসিস। চায়ের নিমন্ত্রণ রইলো।

ফিক করে হেসে ফেললাম।

সীমা ও সাদিক দুজনেই বিব্রত। আড়ষ্ট হয়েই দুজন বিদায় নিল।

আমিও হঠাৎ হাসির জন্য অপ্রস্তুত লজ্জা বোধ করলাম। কিন্তু সাদিকের চায়ের অফার শুনে অজান্তেই হাসি এসে পড়েছিল।

হায়রে চা!

এ চা নিয়েই যতো গণ্ডগোল। আমাদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ। বন্ধুত্বের বন্ধন রশি আলগা হয়ে খুলে গেছে সেই কবে! কাহিনীর শুরু সেই অনেক আগে।

সীমা তখন মোশতাকের বৌ।

প্রায় দুই তিন বছর প্রেম করে মোশতাক ও সীমা বিয়ে করেছিল। সীমার একটা দারুণ গুণ ছিল। সে খুব ভালো চা বানাতে পারতো। আর এটাই নিয়ে মোশতাকের যতো গর্ব।

মোশতাক, যাকে আমরা সবাই *মুসি* বলে ডাকি সে প্রায়ই তার বৌয়ের হাতের বিখ্যাত চা খাওয়ানোর জন্য আমন্ত্রণ জানাতো।

আমরা চা আর নাশতা খেয়ে তাশ পেটাতাম। দলে ছিলাম আমরা জুয়েল, রুবেল, সাদিক, সাকিব, পলাশ, সোহেল, আমি ও সামিউল। প্রায়ই প্রতিদিন সন্ধ্যার পর তার ওখানে আড্ডা জমতো।

আমরা সবাই তখন চাকরিজীবী।

সাদিক ছিল ব্যতিক্রম। সে ছিল ব্যবসায়ী। নিজের গার্মেন্টসের ব্যবসা। ছিল নিজের স্বাধীন মতো চলা। প্রায়ই সে মুসির বাসায় যেতো চা খাওয়ার লোভে। এমনকি মুসি যখন বাসায় থাকতো না তখনো।

সীমাও দারুণ পছন্দ করতো তার চা ভক্ত সাদিককে।

সাদিকও নানান রকম গিফট দিতো তাকে।

প্রথম প্রথম মুসি কিছু মনে না করলেও এক সময় তা কিছুটা সন্দেহের উদ্রেক করে। বেশ কয়েকবার মুসির অনুপস্থিতে তার বাসায় সাদিককে দেখে হালকা খোচা অনুভব করে। কিন্তু বন্ধুত্বের খাতিরে কিছু বলেনি।

সাদিকও মুসির সামনে দোস্ত তোর বৌয়ের চা খাবার জন্য মাঝে মধ্যে ছুটে আসি। বলে গদগদভাবে অনুগত হয়।

হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা বাসায় এসে দরজা বন্ধ দেখে মুসির সন্দেহ হয়। পেছনের জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে, সীমা–সাদিক অন্য রকম চা পান করছে।

তীব্র ঘৃণা বোধে ও লজ্জায় মুসি নিজেকে আড়াল করে পালিয়ে আসে। কাউকে কিছু বলেনি সে, এমনকি সীমাকেও না। ভীষণ অভিমান ছিল তার।

তার দিন দিন বেকে যাওয়া, নিজেকে কেমন নিঃশেষ করে দেয়ার প্রক্রিয়া দেখে জিজ্ঞাসা করি।

সে এড়িয়ে যায়।

শেষে একদিন খুলে বলে সে।

আমরা কেউ বিশ্বাস করতে পারিনি।

সাদিক এমন করলো? সাদিককে কিছু বলতে যাবো।

কিন্তু মুসি না করে।

এদিকে মুসি আর সীমার মধ্যে তখন তীব্র ঠাণ্ডা লড়াই।

অবশেষে একদিন ঘরত্যাগ। ডিভোর্স।

আবার সাদিকের ঘরে ওঠা।

বন্ধু মহলের সবাই তাদের ত্যাগ করি।

মুশতাক একদিন বদলি হয়ে চট্টগ্রাম চলে গেল। আমরা যার যার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলাম।

সেই আড্ডাটা আর নেই, নেই চা খাওয়া।

আজ আবার সাদিকের মুখে চা খাওয়ার কথা শুনে হাসলাম। এই চা খাওয়া নিয়ে এতো ঘটনা! সাদিক হয়তো ভুলে গেছে। কিন্তু আমরা ভুলিনি। তাই তো নিজেকে সাদিকের আসনে কল্পনা করে হেসে উঠেছিলাম।

যেই ভুল মোশতাক করেছে সেই ভুল কি সাদিকও করবে?

সেই চা কি সীমা এখনো বানায়? হয়তো বানায়। কিন্তু এই চা কেবল সাদিকের খাবার কথা। সাদিকও যদি ভুল করে তারও পরিণতি হবে সে রকম।

ভাবতে ভাবতে বাসার পথে রওনা হলাম।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে

টোনাটুনি

– পুটুলি

আমার স্টুপিডটা আমাকে খুব বেশি ভালোবাসে। তার সঙ্গে পরিচয়, বন্ধুত্ব, অতঃপর সম্পর্কের সুন্দর কাহিনী অন্য একদিন লিখবো।

তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ মূলত মোবাইল ফোনে। ছয় মাসে দেখা হয়, এক দুইবার। তাই মোবাইল ফোনের মাধ্যমেই শেয়ার করি আমাদের হাসি, দুষ্টুমি, আনন্দ, কষ্ট, ঝগড়া সব। মূল প্রসঙ্গে আসি।

আমি রাধতে বেশ ভালোবাসি। তাই ও কল করলে প্রায়ই শুনতে পায় আমি এটা–ওটা রান্না করছি। আর শুরু হয় তার আক্ষেপ, কবে যে তোমার হাতের রান্না খাবো? এক কাপ চা দাও ইত্যাদি নানান কথা।

কিন্তু আমাদের দুজনের বাড়ি দুই জেলায়। তবে বিভাগটা একই। আর সে লেখাপড়া করে অন্য এক বিভাগের ইউনিভার্সিটিতে। সুতরাং দেখা হয় ফাস্ট ফুডের দোকানে যেখানে সামনে থাকে বার্গার, পেস্ট্রি। না হয় রিকশা করে ঘুরে বেড়াই। রান্না করে খাওয়াবো কি করে?

অথচ আমারও কি যে প্রবল ইচ্ছা তার জন্য কিছু রান্না করে তাকে খাওয়াই। অন্তত এক কাপ চা! কিন্তু সম্ভব নয়।

এরই মাঝে বিশ্বাসঘাতক বান্ধবীর অশেষ কৃপায় পরিবারে জানাজানি হলে কেড়ে নেয়া হয় আমার মোবাইল ফোন। আমাকে শেকড় শুদ্ধ উপড়ে নিয়ে যাওয়া হয় বাড়ি থেকে বোনের বাড়ি। বন্ধ হয় সমস্ত যোগাযোগ।

কিন্তু ভেঙে পড়িনি কেউ–ই। এরই মাঝে সে দেখা করতে আসে যেখানে থাকি সেখানে। ভাবি, এই সুযোগে তাকে কিছু রান্না করে খাওয়াবো। কিন্তু স্বল্প সময়ে কি রাধি। তাই চট করে হালকা খাবার রেধে ফেললাম, তার সঙ্গে চা।

যখন তার জন্য প্রথম চা বানাই তখন বিশ্বাসই হচ্ছিল না। বার বার নিজের হাতে চিমটি কেটে দেখছিলাম সত্যি কি না। তাকে রুমে বসিয়ে রেখেছিলাম। তাই সে আমার অস্থিরতা দেখতে পায়নি। টেনশনও হচ্ছিল প্রচণ্ড। কি জানি কেমন হবে, লিকার বেশিই হয়ে যায় কি না ইত্যাদি নানান ভাবনা।

এ এক অদ্ভুত অনুভূতি আমার জন্য। এতো আনন্দই হচ্ছিল যে কাদছিলাম। ওই দিনই প্রথম অনুভব করলাম প্রিয়জনের জন্য প্রিয় কিছু তৈরির মজাই অন্য রকম।

যখন তার কাপে দুধ চিনি মেশাচ্ছিলাম তখন দেখি চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। এতো আনন্দ হচ্ছিল। ভাগ্যিস সে রুমে ছিল, চোখের পানি দেখেনি।

যাই হোক। দুই কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকলাম। তার কাপে চিনি ছিল। আমি চিনি খাই না বিধায় চিনি দিইনি। একই রকম কাপ। তাই বলে দিলাম কোনটা তার।

সে তো মহা দুষ্টু! আমি অন্যদিকে তাকাতেই সব এলোমেলো করে ফেললো। বললো, বলো এখন কোনটা তোমার?

কি মুশকিল! আমি ওরটাতে চুমুক দিলাম। তারপর আমারটা ফেরত নিলাম। একবার আমারটা, আরেকবার ওরটা থেকে চা খেয়ে চা শেষ করলাম দুজনে।

চা কেমন হয়েছে জানতে চাইলে বললো, ভালো।

তার কাছে আমার সবই ভালো। তাই বুঝলাম না আসলে কেমন হয়েছে।

প্রিয়জনকে নিজ হাতে কোনো কিছু খাওয়ানোর তৃপ্তি যে কি তা প্রথম ওই দিনই অনুভব করেছি। প্রচণ্ড পারিবারিক ঝামেলার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে আমাদের। তবে দুজনই দিন গুণছি কবে শুরু করবো আমাদের স্বপ্নের ছোট্ট এক রুমের একটা সংসার। দুটো গ্লাস, দুটো প্লেটের সংসার, টোনাটুনির সংসার, পাগলি আর স্টুপিডের সংসার। যে সংসারে আমি রাধবো আর সে বসে থাকবে আমার পাশে।

ঢাকা থেকে

নেশায় বুদ

– অদিতি রায়

রিকশা থেকে লাফ দিয়ে নেমে গুন গুন গান করতে করতে ঘরে ঢুকতেই সাত আটজন লোক দেখতে পেলাম। তার মধ্যে দুজন মহিলা। থমকে দাড়ালাম। ইচ্ছা হলো জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কে বা কেন এসেছেন? জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন বোধ করলাম না। কারণ সকলের শ্যেন দৃষ্টি যেন আমার ওপর বর্ষিত হচ্ছে। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দেখতে পেলাম সবাই মোটামুটি ব্যস্ত। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপার কি? এতোগুলো অপরিচিত লোক এসেছে কোথা থেকে?

মা বললেন, পরিচিত হতে কতোক্ষণ।

বললাম, এদের চাহনি দেখে মনে হলো এই প্রথম একজন ভিন্ন জগতের মানুষ দেখছে।

মা বললেন, তুমি আবার তাদের কিছু বলোনি তো? না বললেই ভালো। ওরা তোমার মেজদিকে দেখতে এসেছে।

সঙ্গে সঙ্গে *ইয়াহু* বলে আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। এই আনন্দের খরবটা জানলে এমনটি হতো না।

মা বললেন, কলেজে গিয়ে খবরটা তোমাকে জানাতে হতো নাকি?

বললাম, না। তবে ওদের চাহনি পছন্দ হয়নি।

ভাবলাম এবার খুব মজা হবে। বড়দের বিয়েতে ছোট ছিলাম বলে কোনো আনন্দ করতে পারিনি। এবার আনন্দের শেষ থাকবে না। সবে কলেজে ঢুকেছি, এমনিতেই ড্যাম কেয়ার ভাব। তারপর বিয়ের খুশি। কি করবো, কি বলবো ভেবে পাচ্ছি না। অতিথি আপ্যায়নের শেষ পর্যায়ে মেজদিকে দেখানো হলো। মনে হলো ওদের পছন্দ হয়েছে।

হবেই না বা কেন! আমার মেজদির মতো এতো সুন্দরী এ তল্লাটে একটিও নেই। যেমন গুণী তেমনি সুন্দরী। মনে হলো, কলেজের সব বান্ধবীদের নিয়ে বিয়েতে হই হুল্লোড় করে কাটাবো।

মাকে বললাম, শেষ পর্বে চা-টা কি আমি পরিবেশন করতে পারি?

মা বললেন, পারো। তবে ওদের সামনে উল্টা-পাল্টা কিছু বলো না।

ঠিক আছে বলে চায়ের ট্রে হাতে ঢুকে টেবিলে ট্রে রেখে কাপ-পিরিচসহ সকলকে চা তুলে দিচ্ছি। হঠাৎ করে একটি বিনুনী এসে চায়ের মধ্যে পড়লো। লজ্জা পেলাম এতোগুলো মানুষের সামনে। কলেজ থেকে ফিরে বিনুনী আর খোলা হয়নি মানে আনন্দে খুলতেই ভুলে গিয়েছি। বড় চুলের ওই এক ঝামেলা।

তাড়াতাড়ি ওই কাপটি একটু সরিয়ে রেখে সবাইকে পরিবেশন করে আরেক কাপ চা আনতে যাবো। বাদ পরা ভদ্রলোক বললেন, আর চা লাগবে না, আমি চা খাই না।

বললাম, না না, তা কেন, আমি এটা পাল্টিয়ে...

ভদ্রলোক থামিয়ে দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, এই কাপটিই দিন।

ইতস্তত করে চায়ের কাপ দিলাম। ভাবলাম ভদ্রলোক সম্ভবত খেয়াল করেননি, বিনুনী কাপের মধ্যে পড়েছে। এবার বিদায়ের পালা। ভদ্রতার খাতিরে বললাম, আবার আসবেন।

ভদ্রলোক পাশে এসে আস্তে করে বললেন, চুল ডোবানো চা খেতে দারুণ লেগেছে।

লজ্জায় মাথা নিচু করে বললাম, এক্সট্রিমলি সরি।

তার আর দরকার হবে না, বলে বিদায় নিলেন।

পরে ওরা জানিয়েছেন, ওই ভদ্রলোক নয় তার দাদার জন্য পাত্রী দেখতে গিয়েছিলেন। দাদা অন্যত্র পাত্রী পছন্দ করেছেন। তাই দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

প্রচণ্ড রাগে লোকগুলোকে বকা দিলাম আর বললাম, ওদের পোড়া কপাল, এতো সুন্দর বৌ ওদের কপালে জুটলো না।

মা আমার রাগ দেখে বললেন, চুপ থাকো।

বললাম, আগে জানলে মরিচ দিয়ে চা বানিয়ে দিতাম।

মা আমাকে দমিয়ে দিয়ে বললেন, তুমিও কালো মেয়ে। সুতরাং এতো চটাং চটাং কথা বলা তোমার ঠিক না।

মা, আমি কালো ঠিক। তবে কারো কাছে সেধে যাবো না। যে সেধে নেবে তার সঙ্গে বিয়ে হবে নতুবা সারা জীবন চাকরি করে খাবো। তবুও কারো কাছে মাথা নত করে তোমাদের ছোট করে কারো ঘরে যাবো না।

বেশ কিছুদিন পর মেজদির বিয়ে ঠিক হলো। এবার আমার আনন্দ দেখে কে? বিয়ের শপিং থেকে শুরু করে কার্ড বিলি সব আমি করছি।

মেজদি চলে গেলেন। আমি একা। ইতিমধ্যে এইচএসসি পরীক্ষা শেষ।

মা আমাকে ইনিয়ে-বিনিয়ে কিছু বলতে চাচ্ছেন, রেজাল্ট খারাপ হলে বিদায় করে দেবেন।

এ ধরনের কটু বাক্যও শুনতে হলো।

রেজাল্ট আশানুরূপ হওয়াতে মা খুশি।

ডিগ্রিতে ভর্তি হলাম।

মা জানালেন, তোমার মেজদিকে যে দেখতে এসেছিল সেই তোমাকে পছন্দ করেছে এবং এখন যে বিয়ে হলো তা ওই ছেলেই পাঠিয়েছে।

প্রচণ্ড রাগে বললাম, আমি বিয়েই করবো না।

কিন্তু মা, দাদাদের সিদ্ধান্তে বিয়ে হয়ে গেল।

বাসর রাতে ভদ্রলোককে বললাম, মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন কেন?

বললেন, তুমি করে না বললে কারণটা বলবো না।

আচ্ছা, ঠিক আছে এবার বলো?

সঙ্গে সঙ্গে সে আমাকে কোলে তুলে নিল। তারপর খাটে বসিয়ে বললো, এক মিনিট। একটি ফ্লাস্ক থেকে এক কাপ চা ঢেলে এনে বললো, আগে তুমি খাও।

বললাম, তুমি?

এরপর দুজনেই এক সঙ্গে চুমুক দিতে গিয়ে দুজনের ঠোঁট এক হয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

সকালে সে বললো, সেই সেদিন থেকে তুমি চুল ডোবানো চা খাইয়ে আমাকে নেশায় বুঁদ করে রেখেছো। আমি তোমার সুন্দর মেজদিকে বিয়ে করিনি তোমার লাবণ্যময়ী মুখ, মায়াভরা চোখ আর ওই সুন্দর চুলগুলো দেখে যা তোমার মেজদির নেই। এখন থেকে চুল ডুবিয়ে চা দেবে যেন সারা জীবন তোমার জন্য পাগল থাকি।

ঢাকা থেকে

অভিনব

– সুমী

আমার জীবনে ঘটে যাওয়া একটি সত্য ঘটনা লিখছি। জানি না পাঠক কিভাবে নেবেন। চা পানের অভিনব কৌশল আমার জানা ছিল না। এটি তার প্রথম অভিজ্ঞতা, নাকি আরো প্রয়োগ করেছে তাও জানার সুযোগ পাইনি।

আমার স্বামী প্রয়াত হয়েছেন অকালে। আমার এক দেবর আমার চেয়ে আট নয় বছরের বড়। তার প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ বোধ করতাম অনেক আগ থেকেই। কিন্তু কখনোই তাকে বুঝতে দিতাম না। দাম্পত্য জীবনে আমরা দুজনই সমান অসুখী। এখন আমি একাকী জীবনে অভ্যস্ত। ঢাকায় বসবাস করলেও আমাদের যোগাযোগ খুব কম।

একদিন পারিবারিক এক কাজে তার সঙ্গে ফোনে আলাপ হলে সে আমাকে বাসায় আসতে অনুরোধ করে।

ছুটির দিন বাসায় যাই। বাসায় গিয়ে দেখি সে ছাড়া আর কেউ নেই।

সে জানতে চাইলো, আমি বাসায় আসতে আশপাশের কেউ দেখেছে কি না।

এ কথা শুনে আমার হার্টবিট বেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যেতে চাইলাম।

সে দরজা আটকিয়ে আমাকে বসতে বললো, খুব স্বাভাবিক আচরণ করলো।

চা খাবে? বলে নিজেই চা বানাতে গেল।

প্রায় এক মগ চা বানালো।

আমাকে দাড় করিয়ে খুব আলতোভাবে এক হাতে ধরলো, আরেক হাতে চায়ের মগ থেকে মুখে চা নিয়ে আমাকে চা পান করালো, নিজেও চা পান করলো।

এরপর হলো এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা।

সম্মোহিতের মতো তার মুখের ভেতর থেকে চা পান করলাম।

সেই সময়ের অনুভূতি অবর্ণনীয়।

সে একজন সুপুরুষ। তার সঙ্গে আরো অনেক নারীর সম্পর্ক হতে পারে। কারণ তার ব্যবসাটা এমন ধরনের যেখানে প্রতিদিন এক ডজন যে কোনো বয়সের নারী আসা–যাওয়া করে। তাছাড়া একজন নারী যে সহজে পেতে পারে তার কাছে ভালোবাসা আশা করা মূল্যহীন।

তার প্রতি শত আবেগ, অনুরাগ থাকলেও তাকে প্রতিদিন মনে মনে ঘৃণা করে দূরে রাখি। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করি। কারণ তার প্রতি আমার দুর্নিবার আকর্ষণ।

হবিগঞ্জ থেকে

কয়েকটি

– রফিকুন্নেসা হুদা

কাউকে আপ্যায়ন করার প্রধান উপকরণ চা। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, *চা করিতে করিতে ভৃত্য নফর নাম হারাইয়া হইল চাকর*।

চা নিয়ে হাজারো স্মৃতির মাঝে কয়েকটি বলবো।

বাবার চাকরি সূত্রে আমরা যখন সিলেট ছিলাম তখন বহুবার চা বাগান দেখার সুযোগ হয়েছিল। চায়ের ফ্যাক্টরিতে চা তৈরির প্রক্রিয়া যতোটা না আমাকে আকৃষ্ট করেছে তারচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে দল বেধে পিঠে ঝুড়ি নিয়ে চা পাতা সংগ্রহরত মহিলাদের নিপুণ হাতে ছোট দুটি পাতা টুক করে ছিড়ে ঝুড়িতে তুলে নেয়া। সে এক অপরূপ দৃশ্য!

রাতের ট্রেনে চলতি পথে যখন আখাউড়া বা অন্য কোনো স্টেশনে ট্রেন থামে তখন হকারদের *চা গরম চা* গরম চিৎকারটা বিরক্তিকর নয়।

পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্রী ছিলাম এবং থাকতাম ছাত্রী হলে (বর্তমান রোকেয়া হল) তখন চুরি করে তিন রুমমেট মিলে চা খেতাম। সরঞ্জাম থাকতো খাটের নিচে এক কোণে। কারণ হলে চা খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। মিসেস আখতার ইমাম ছিলেন আমাদের প্রভোস্ট যাকে আমরা যমের মতো ভয় করতাম। সেই চুরি করে চা খাওয়ার যে কি আনন্দ তা কাউকে বলে বোঝানো যাবে না। সেটা আজো স্মৃতিতে অমলিন।

ইউনিভার্সিটির ছুটির পর একবার বাবার সঙ্গে ভোলা যাচ্ছি লঞ্চে। বাবা তখন চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ভোলাতেই থাকতেন। সে সময় ঢাকা থেকে সরাসরি ভোলা যাওয়া হতো না। ঢাকা থেকে স্টিমারে বরিশাল, তারপর ছোট একটা এক তলা লঞ্চে ভোলা যেতাম। বিকালে তিনটায় লঞ্চ ছাড়তো আর সন্ধ্যা ছয়টায় পৌছে যেতাম।

সেই লঞ্চে সেদিন লঞ্চ মালিকও ছিলেন। বাবার সঙ্গে আলাপচারিতায় যখন তিনি জানতে পারলেন আমিও আছি বাবার সঙ্গে তখন তিনি এসে আমার সঙ্গে কথা বলে আমাকে অনেক আদর করে বললেন, তুমি আমার দেশের মেয়ে, ইউনিভার্সিটিতে পড়ছো, খুব খুশি হলাম, দোয়া করি অনেক বড় হও।

সে সময় নগণ্য সংখ্যক মেয়েরাই পড়াশোনা করতো। তিনি আমাকে এককাপ চা খাওয়ালেন। লঞ্চের সেই শাদা ছোট–মোটা কাপের চায়ে ছিল অনেক আন্তরিকতা, অনেক মায়া। তিনি চায়ের দাম নিলেন না এবং আমার ভাড়াটাও নেননি। সেদিনের ওনার সেই আন্তরিকতা ভুলে যাবার মতো নয়।

চল্লিশ দশকের কথা। এ ভোলাতেই প্রথম চা খাই আমার বড় বোনের স্কুলে। বাসায় শুধু বড়রাই চা খেতেন, বাচ্চারা নয়। ভোলা ব্লান্ডি গার্লস স্কুলে আমার বড় বোন এবং চাচাতো বোন দুজনই পড়তেন। বড় বোন সম্ভবত ক্লাস ফাইভে এবং চাচাতো বোন ক্লাস ফোরে। আমরা তখনো পড়াশোনা শুরু করিনি।

আমার বাবা তখন ভোলাতেই চাকরি করতেন।

কালিবাড়ি রোডে আমাদের বাড়ি থেকে রাস্তা পার হলেই বড় রাস্তার ওপরে ভোলা ব্লান্ডি গার্লস স্কুল।
একদিন বড় বোন এসে মাকে বললেন, স্কুলে সবাইকে ফৃ চা খাওয়ানো হবে তিন দিন। বলা হয়েছে বাসা থেকে ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে দুপুরে টিফিনের সময় স্কুলে নিয়ে যেতে।
বাড়িতে আমরা ছোট চার ভাইবোন। দুই চাচাতো ভাই শহীদুল্লাহ রতন, ওবায়েদউল্লাহ কাঞ্চন এবং আমি ও আমার ভাই ফয়েজউল্লাহ মিন্টু পরদিন গেলাম বুবুদের স্কুলে।
আমার বুবু টিফিনের সময় এসে আমাদের নিয়ে গেলেন।
স্কুলের পাশে বেশ বড় একটা লম্বা টিন শেডের ঘরে লম্বা সারিতে বেঞ্চ পাতা। আমরা সবাই বসলাম। আরো অনেক লোক, অনেক বাচ্চা, অন্য সবার ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন।
স্কুলের দফতরি এবং আয়া খুব সুন্দর বড় একটা পাতলা চায়ের কাপে আমাদের চা দিল।
সবাইকে একই রকম কাপে চা দিল, সঙ্গে দুটা করে বিস্কিট। সামনে টেবিলে সবারই চা সাজানো। কি চমৎকার সুঘ্রাণ।
চায়ের পিরিচে চা ঢেলে ফু দিয়ে পিরিচের চা ঠাণ্ডা করছিল সবাই।
সবাই যখন ফু দিয়ে পিরিচের চা ঠাণ্ডা করে ফুরুৎ শব্দ করে খাচ্ছিল এবং সেটা কতো মজা করে খাওয়া সে কথা আজো ভুলিনি।
ফেরার সময় সবাইকে এক প্যাকেট চা এবং এক প্যাকেট বিস্কিট দিল বাড়ি গিয়ে খাওয়ার জন্য।
শুনেছি কোনো এক বিদেশি কম্পানির এ দেশের মানুষের মধ্যে চায়ের অভ্যাস করানোর জন্য এ প্রচেষ্টা।
কিন্তু সেদিনের সেই প্রথম চা খাওয়ার স্বাদ যেন এখনো মুখে লেগে আছে। ঘন দুধ আর লিকারের কি চমৎকার চা! জীবনের প্রান্তবেলায় এখন সকাল-বিকেল দুই কাপ রঙ চা-ই আমার বরাদ্দ।
আমার ঘরে ছিল নিত্যদিনই চায়ের আড্ডা। কতো মানুষ আমার ঘরে এই চায়ের মজলিশে এসেছে সে কথা এখনো মনে পড়ে। আমার মেয়ে মিতার হাতের তৈরি চায়ের যথেষ্ট সুনাম ছিল। মিতার হাতের তৈরি চা খেতে প্রায়ই বিকেলে ছুটে আসতেন তার দুলাভাই শাহজাহান সিদ্দিকী।
মিতার আব্বুও মেয়ের হাতের চা খেয়ে তৃপ্তি বোধ করতেন। ঘন ঘন চা খেতেন বলে মাঝে মধ্যে বলতাম, এতো চা খাওয়া ঠিক নয়। সাংবাদিক মানুষ, অনেক রাত জেগে কাজ করতেন।
আমি ঘুমিয়ে পড়তাম।
মাঝে মধ্যে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলতেন, এক কাপ চা দাও না।
বিনা বাক্য ব্যয়ে তাকে চা করে দিতাম।
আজ আর সে মানুষটি নেই।
চায়ের জন্য আমাকে আর ঘুম থেকে গভীর রাতে কেউ ডেকে তোলে না।
বাসায় আর সেই চায়ের কাপে ঝড় ওঠে না, আমিও চা তৈরি করি না।

মহাখালী, ঢাকা থেকে

রশিদ

– মোহাম্মদ জাবেদ হোসেন

আমাদের পরিবারের চায়ের টেবিলে প্রতিদিন ভাইবোনের খুনসুটি লেগেই থাকতো। কার কাপে আম্মু বেশি চা দিয়েছেন, কার কম দিয়েছেন এ নিয়ে চলতো ঝগড়া।
ঝগড়া থামাতে আম্মু দুই কাপেই আরেকটু করে চা দিয়ে থামিয়ে দিতেন আমাদের।

এরপর আমরা নামতাম নতুন খেলায়। আম্মুর চায়ের স্বাদ পরখ করে তার ফলাফল দিতাম আমরা। চা ভালো হলে সেটা *ক্যাফে মারলিন* আর ভালো না হলে সেটা *দুলালের বাপের চা।* ক্যাফে মারলিন মানে অভিজাত রেস্টুরেন্টের দামি চা, আর দুলালের বাপের চা মানে কম দামি রেস্টুরেন্টের কম দামি চা। দুটোই আমাদের পাড়ার দোকান।

আম্মু সব সময়ই চাইতেন তার চা ক্যাফে মারলিনের মতো হোক। কিন্তু সেটা সব সময় হতো না। আসলে চা বানানোটাও একটা শিল্প। আর শিল্পীর সব কাজও সব সময় ভালো হয় না।

বাবুলকে শিল্পী বলা যাবে কি না জানি না। সে একটি চায়ের দোকানে চায়ের কারিগরের কাজ করে। শৈল্পিক চা তৈরির চর্চা সে করে না। তার কাজ শুধুই সারাক্ষণ চা বানানো। কিন্তু সেটা রশিদ বুঝতে চাইবে কেন?

রশিদ একজন রিকশাচালক। কিছুটা ক্ষ্যাপাটে ধরনের। গায়ে পড়ে ঝগড়া করা তার স্বভাব। রাস্তার পাশে রিকশা সাইড করে রেখে সে হাক ছাড়লো – ওই *বাবুইল্যা, ভালো করে এক কাপ চা দে। তুই যে চা বানাস, মজা টজা কিচ্ছু হয় না।*

অমনি ক্ষেপে গিয়ে বাবুলের জবাব, অতো স্পেশাল করে চা বানাতে পারবো না। সবার জন্য যেভাবে বানাই, তোমার জন্যও তা। পোষাইলে খাও, নয়তো নিজে বানিয়ে খাও।

চা তৈরি করা এ আর তেমন কঠিন কি কাজ, এমন ভঙ্গিতে রশিদ নিজেই চা বানানোর সিদ্ধান্ত নিল।

কোণার একটি টেবিলে বসে পুরো ব্যাপারটায় বেশ মজা পাচ্ছি।

রশিদ নিজ হাতে এক কাপ চা বানিয়ে এসে বীরের ভঙ্গিতে একটি টেবিলে বসে পড়লো। তারপর নায়কের স্টাইলে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই মুখটা বিকৃত করে ফেললো, যেন চা নয়, নিম পাতার রস খেয়েছে।

তারপর হুংকার ছেড়ে বললো, ওই বাবুইল্ল্যার বাচ্চা বাবুইল্ল্যা, চিনির কৌটা আর লবণের কৌটা আলাদা রাখতে পারিস না?

পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম থেকে

jabed.ctg@gmail.com

রকমফের

– মোহাম্মদ কামরুল হাসান

খাটি দুধ চা

মাত্র যমুনা বৃজ চালু হয়েছে, অথচ বৃজটি দেখতে যাবার সুযোগ হয়ে উঠছে না। এরই মাঝে দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকার পর জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির ক্লাস শুরুর ঘোষণা হলো। রথ দেখা এবং কলা বেচার ইচ্ছায় বেরিয়ে পড়লাম।

যাত্রাবিরতি দেয়া হলো অভিজাত হোটেলে।

নামের মতোই হোটেলের খাবারের দাম তালিকাসহ সব কিছুই অভিজাত। সফট ড্রিংকসের অর্ডার দিয়ে একটা কর্নারের টেবিলে বসলাম। পাশের টেবিলে সমবয়সী কয়েকজন চায়ের অর্ডার দিয়ে বসলো।

বেয়ারা টেবিলে চা তৈরির সরঞ্জাম অর্থাৎ পিরিচ, পেয়ালা, চামচ, টিব্যাগ, টিপট, দুধ, চিনি ট্রে-তে করে দিয়ে গেল। আমি আগে কখনো এভাবে চা পরিবেশন করতে দেখিনি। যার যে উপাদান যতোটুকু দরকার সে তার নিজের চাহিদা অনুযায়ী নিয়ে নেবে।

হোটেলের ব্যবস্থাপনা দেখে যতোটুকু না অবাক হয়েছিলাম তারচেয়ে বেশি অবাক হলাম যখন দেখলাম তরুণ দল কাপে গরম পানি না নিয়ে দুধ ঢেলে কাপ পূর্ণ করলো এবং তার মাঝে টিব্যাগ ছেড়ে দিয়ে ইচ্ছামতো চিনি মেশালো। পানি ছাড়া শুধু দুধের মাঝে বা শুধু দুধ দিয়ে কাউকে চা খেতে আগে দেখিনি। চা পান শেষে তরুণ দলের মন্তব্য, এটাকেই বলে দুধ চা, খাটি দুধ চা খাওয়াও হলো, দামও উসুল হলো।

চায়ে লেবু নয় লেবুতে চা

গ্রীষ্মকালীন ছুটি উপলক্ষে ক্যাম্পাস বন্ধ সময় কিভাবে কাটাবো যখন ভেবে পাচ্ছি না। আমার ছোট চাচা প্রস্তাব দিলেন মানিকগঞ্জ জেলার কোনো এক পীরের ওরশে যাবার। তিনি সেই পীরের মুরিদ। পীর–ফকিরে বিশ্বাসী নই, তারপরও সময় কাটানোর তাগিদে এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ইচ্ছায় রাজি হলাম। ওরশে গিয়ে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার বর্ণনা দিয়ে পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না, শুধু চা খাওয়া সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার কথা বলবো।

ওরশ মোবারকে পরীরের ভক্তদের কার্যকলাপ দেখে যখন আমি ত্যাক্ত–বিরক্ত তখন অবাক হলাম কিছু ভক্তের চা খাওয়ার করার দৃশ্য দেখে। মাটির তৈরি হাতল বিহীন পেয়ালাতে তারা চা খাচ্ছিল তাকেই সম্ভবত *লেবু চা* বলা উচিত। কারণ লেবুকে হামান দিস্তায় পিষে তার রস দিয়ে চা তৈরি করে খাচ্ছে।

কারণ অনুসন্ধান করে জানলাম, পীর সাহেব নিজে লেবু চা পছন্দ করতেন। তাছাড়া পীরের নিজের হাতে লাগানো লেবু গাছের ফলের কোনো অংশই তারা নষ্ট করতে রাজি নয় বিধায় এই ব্যবস্থা।

রঙ চা

বন্ধু–বান্ধবীদের আড্ডায় চা একটি কমন ব্যাপার হলেও আমার বন্ধুদের জন্য আড্ডায় চা সমস্যা হয়ে দাড়ায়। সাধারণত চা পছন্দ করি না বলে খাই না এবং বন্ধুদেরও নিবৃত্ত করার চেষ্টা করি।

যদিও আমার চেষ্টা কখনোই সফলতার মুখ দেখে না, বরং মাঝে মধ্যে ওরাই সফল হয় এবং আমাকে চা পানে বাধ্য করে। ওদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে এবং আমার প্রচেষ্টা সফল করতে ফন্দি আটতে লাগলাম।

বন্ধু–বান্ধবীরা আমাদের কেন্দ্রীয় মাঠে আড্ডা দিচ্ছি এমন সময় ছোট একটি ছেলে চায়ের ফ্লাস্ক নিয়ে এসে চা দিতে চাইলে বন্ধুরা অনুমতি দিল।

সবার জন্য এক কাপ করে চা সে ঢেলে ফেলেছে।

দরিদ্র ছেলেটির চা নষ্ট করতে মন সায় না দেয়ায় এবং বন্ধুদের অনুরোধে কাপে ঠোঁট ছোয়ালাম।

বন্ধুরা যখন আরাম করে চা খাচ্ছে তখন ওয়াক থু করে মুখ থেকে চা বাইরে ফেলে দিয়ে বললাম এই *ঘোড়ার পেচ্ছাপ তোরা* খাচ্ছিস কিভাবে?

বন্ধুরা তাদের প্রিয় চাকে *ঘোড়ার পেচ্ছাপ* বলায় আমার দিকে তেড়ে এলে আত্মরক্ষার্থে বললাম, কথাটা আমার নয়, সমরেশ মজুমদার অথবা সুনীল অথবা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কোনো এক উপন্যাসের (খুব সম্ভবত *ছবিওয়ালা*) নায়িকা যে উপন্যাসেও সিনেমার নায়িকা, তার ভাই সিনেমা পাড়ায় গেলে তাকে রঙ চা খেতে দিলে সে আমার মতো চা এবং কাপ ছুড়ে ফেলে উক্তিটি করেছিল। সেটা হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় বললাম।

আমার এই বক্তব্যের পর বন্ধুদের মন্তব্য, আমাদের সঙ্গে থাকতে থাকতে তুইও একদিন এই ঘোড়ার পেচ্ছাপ অর্থাৎ রঙ চা পানে অভ্যস্ত হয়ে উঠবি।

বন্ধুদের সেই প্রচেষ্টা সফল না হলেও তারপর থেকে রঙ চা আমার বন্ধু মহলে পরিচিত হয়ে গেল *ঘোড়ার পেচ্ছাপ* হিসেবে।

চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে

স্যালাইন

– তাহারিন তৌহিদা

কারেন্ট নেই। ঘর ভর্তি অতিথি। চুলায় পানি দিয়ে আপি কোথায় যেন গেছেন। পানি ফুটছে। অযথা গ্যাসের অপচয়! এদিক-ওদিক আপিকে না দেখে পানিতে চা পাতা দিলাম। বেশি করে দিলাম। কারণ চা ভালো হতে হবে। এরপর দুধ চিনি দিয়ে যখন মামাকে খেতে দিলাম, দেন দেয়ার ইজ সাম প্রবলেম।

মামা এক চুমুক দিয়ে বললেন, এতে কি লবণ দিয়েছিস নাকি এ্যা!

চিনি চেক করলাম। না, চিনি মনে করে লবণ দিইনি। পূর্ণ ননীযুক্ত গুড়ো দুধ খেয়ে দেখলাম, সমস্যা নেই। কিন্তু চা খেতে স্যালাইনের মতো লাগছে। কি হলো! ব্যাপার কি!

ওদিকে আপি খোজাখুজি করে হাত পা ছুড়ছেন পানি কোথায় গেল। ডাইনিং রুমে এসে কাপ-পিরিচ দেখে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কি ওই পানি দিয়ে চা বানিয়েছিস নাকি!

হ্যা।

খেয়ে দেখেছিস।

হ্যা, কেমন স্যালাইনের মতো লাগছে। চায়ে লবণ দেইনি তো।

আমি দিয়েছিলাম। ওটা নুডলস সিদ্ধ করার পানি ছিল।

খুলনা থেকে

মহারাজা

চা শব্দটার মধ্যে যে একটা মাদকতা লুকিয়ে আছে সেটা একমাত্র চা প্রেমিকরা ছাড়া কেউ বুঝবে না। আমাদেরকে ভাত না দিলেও কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু চা যেন মিস না হয়।

বিদেশে যেখানেই যাই আসার সময় মিনিমাম দুই প্যাকেট চা নিয়ে আসি। সে বছর ব্যাংককে গিয়ে *পিক অ্যান্ড পে* নামে একটা স্টোর-এ ঢুকলাম। দেখতে দেখতে চা সেকশনে এলাম। এবং চা সেকশন দেখে তো আমি অবাক। কারণ বিশ্বের এমন কোনো দেশ নেই যে দেশের চা ওখানে নেই।

ওখানে অনেক রকম চা দেখলাম – গৃন, ব্ল্যাক। এই ফ্লেভার – সেই ফ্লেভার। নাম না জানা হাজার টাইপের। সব ধরনের চা থেকে এক প্যাকেট করে স্যাম্পল নিলাম। এবং এতে বাস্কেট পুরো ভরে গেল। যেই বিলিং সেকশনে গেলাম, হঠাৎ মনে হলো যতোগুলো চা নিলাম ততোদিন বাচবো কি না সন্দেহ।

তারপর এখানে প্রতি প্যাকেট চা বাংলাদেশি টাকায় পাচশ থেকে এক হাজার কিংবা আরো বেশি। চিন্তা করলাম বাসায় এখনো কয়েক প্যাকেট গৃন টি এবং দার্জিলিং টি আছে। আগে ওইগুলো শেষ হোক, তারপর নেয়া যাবে।

এরপর প্যাকেটগুলো যেখান থেকে নিয়েছি, আবার সেখানে রিপ্লেস করে দিলাম।

এখানে আরেকটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার, ব্যক্তিগতভাবে লাল চা খেতেই বেশি পছন্দ করি।

গত দশ বছর অনেকবার চিন্তা করেছি, চা খাওয়া ছেড়ে দেবো। কিন্তু যতোবারই ছাড়তে গেছি ততোবারই চা খাওয়া বেড়ে গেছে। তাই এখন ছাড়ার কথা চিন্তা করি না।

দেশীয় প্রেক্ষাপটে যে সমস্যাটা ফেস করি তা হলো, এখানে কোনো হোটেলেই রেড টি, গৃন টি এগুলো পাওয়া যায় না দামি হোটেল ছাড়া।

আমার চায়ে আদা, এলাচি ছাড়াও একটা আনকমন এবং বিশেষ উপাদান আছে সেটা হলো, আমার বাগানের ইরানি সুগন্ধী লেবু পাতা। এই লেবু পাতা দেয়ার পর শুধু কাপটা নয়, এমনকি আমার পুরো ঘরটায়

সুন্দর সুগন্ধে ভরে যায়। এবং আমি রাজকীয় ভঙ্গিতে আয়েশ করে চায়ের মগে চুমুক দিতে থাকি। তখন নিজেকে মনে হয় আগের দিনের নবাব অথবা মহারাজা।

বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম থেকে

তে- তে

– শামীম চৌধুরী

মালয় ভাষায় চা–কে বলা হয় *তে* (TEH)। বরফ মিশ্রিত চা অর্থাৎ টি আইসকে এরা বলে *তে আইস।* এই তে আইস–ই হচ্ছে আমার প্রিয় পানীয়। অনেক সময় বিভিন্ন জায়গায় এই তে আইস খেতে গেলে আমাকে বেশ বিব্রত হতে হয় আমার তোতলামির কারণে।

এই তোতলামির কারণে অনেক সময় সমস্যার মধ্যেও পরতে হয় যেটা লজ্জাজনক এবং দুঃখের। একাকী কোনো রেস্তোরায় গেলে আমার প্রিয় পানীয়টির অর্ডার দেয়ার আগে পুরোদমে প্রস্তুতি নিতে হয়। একাকী রিহার্সালও দিতে হয় কয়েকবার। তারপর অর্ডার।

একটি ঘটনার কথা বলি, একদিন কুয়ালা লামপুরে একটি রেস্টুরেন্টে গিয়েছি একাকী। টেবিল দখল করে বসতেই বেয়ারা এসে জিজ্ঞাসা করলো, কি চাই?

তাকে ফিরিয়ে দিলাম এবং পরে আসতে বললাম। এর মধ্যে আমি তে আইস কথাটা ভালোভাবে উচ্চারণ করার জন্য ট্রায়াল দিতে শুরু করলাম। পরে যখন বেয়ারাকে ডেকে তে আইস বলতে যাবে তখনই আটকে গেলাম। না পারছি কথা বলতে, না পারছি কথা ছাড়তে।

বেয়ারা আবারও জিজ্ঞাসা করলো, কি দেবো?

অনেক কষ্টে তোতলা মুখে বললাম, তে–তে আইস।

লক্ষ্য করলাম বেয়ারাটি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভদ্রভাবে আবারও জিজ্ঞাসা করলো, *আপা মাউ* (কি চাও)?

আমি খুব সমস্যায় পড়ে গেলাম। অনেক কষ্টে একবার বলেছি, আবারও বলতে গেলে আমার অবস্থা টাইট হয়ে যাবে।

বেটা বেয়ারা বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অর্ডারের অপেক্ষায়।

আবারও তে আইস বলতে গিয়ে আটকে গেলাম এবং কিছু সময় পর আবারও উচ্চারিত হলো তে–তে আইস।

এবার বেয়ারা প্রচণ্ড রেগে গিয়ে ভদ্রতার সঙ্গে তার বিরক্তিভাব প্রকাশ করলো, *জাংগান মাইন মাইন লা কাওয়ান চেকাপ বাইক বাইক আপা মিনম মাউ* (ফাজলামো করো না বন্ধু, ভালোভাবে বলো কি ড্রিংকস চাচ্ছ)?

আমার প্রিয় তে আইস আর খাওয়া হলো না সেদিন। তার রাগান্বিত চেহারা দেখে ঝটপট বলে দিলাম, *ওকে মিলো আইস লা ...* (ঠিক আছে মাইলো আইস ...)।

ইয়ালা চেকাপ মিলো আইস (বললেই হয় মিলো আইস) বলেই বেয়ারা আমার সামনে থেকে চলে গেল।

আমি এখন ধাধা হিসেবে আপনাদের একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি, বলুন তো বেয়ারা কেন আমার ওপর রেগে গিয়েছিলেন?

অবশ্য মালয় ভাষা যারা জানে তারাই হয়তো এর উত্তর দিতে পারবে। হয়তো ভাবছেন আমি তোতলামির কারণে বেয়ারার মূল্যবান সময় নষ্ট করেছি, তাই।

আসলে তা নয়। চা অর্থাৎ তে–কে তোতলামির কারণে যেহেতু দুইবার অর্থাৎ তে–তে উচ্চারণ করেছি সেহেতু তিনি আমার ওপর রেগে গিয়েছিলেন।

কারণ মালয় ভাষায় স্তন কে বলা হয় তে–তে।

কুয়ালা লামপুর থেকে

shameem@maxis.net.my

রক্ষা

– শাহাবুদ্দিন আহমেদ শুভ

১৯৯৬ সালের শেষ দিকে আমি ও আমার দুই চাচাতো ভাই ছোট চাচার সঙ্গে ওনার শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। চাচা নতুন বিয়ে করেছেন। তাই স্কুল বন্ধ দিয়ে নানার বাড়িতে অর্থাৎ চাচির বাবার বাড়িতে গেলাম।

নানার বাড়িতে গিয়ে পৌছালাম বিকাল তিনটার দিকে। হাল্কা নাশতা সেরে বেরিয়ে পরলাম পাহাড় দেখবো বলে। কারণ এর আগে পাহাড়ি কোথাও বেড়াতে যাইনি।

সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার সমবয়সী এক মামার সঙ্গে ঘুরে বেড়ালাম পাহাড়ের বিভিন্ন উচু-নিচু সরু পথ ধরে। রাতে খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে ঘুম থেকে চাচী আমাদের ডেকে তুললেন। আমরা নাশতা করলাম। নাশতার পর দেয়া হলো চা। চা খাওয়ার এক পর্যায়ে আমার হাত থেকে চায়ের কাপ পরে ভেঙে গেল। আমি তখন কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না।

আমার চাচাতো ভাই কেউ দেখার আগেই ভাঙা কাপ তার প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে ফেললো এবং সময় বুঝে আমাদের সঙ্গে রাখা কাপড়ের ব্যাগের ভেতর ঢোকালো। নানুর বাড়িতে ফেলে দেয়নি যদি কেউ দেখে ফেলে এই ভয়ে।

পরের দিন আমরা বাড়িতে আসার পর ভাঙা কাপটি ফেলা হলো। সেদিন চাচাতো ভাইয়ের বুদ্ধির জন্য লজ্জার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম।

সিলেট থেকে

নীলকণ্ঠ

– সৈয়দ মিজানুর রহমান

আমরা কয়েক বন্ধু ঘুরে বেড়িয়েছিলাম শ্রীমঙ্গল বিটিআরআই-এর নয়নাভিরাম ও সবুজের কোল ঘেষে। হঠাৎ একটি ছন, বাশের তৈরি চা দোকানের দিকে আমার চোখ আটকে যায়। কতোকগুলো মানুষ দোকানটির সামনে ভিড় করে দাড়িয়ে আছে। মনে মনে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। কৌতূহলী হলাম এ জন্য, শহর থেকে দূরে এমন একটা জনমানবশূন্য এলাকায় এভাবে দোকানে ভিড় লেগে থাকার কথা নয় কোনো কারণ ছাড়া। সবাই এগিয়ে গেলাম।

দেখলাম ত্রিশোর্ধ এক লোক কুজো হয়ে চায়ের গ্লাসে চামচ নাড়াচ্ছেন। এবং লোকজন গ্লাস হাতে নিয়ে চা খাচ্ছেন। এবার দেখি গ্লাসের দিকে। দুই স্তর, তিন স্তর ও পাচ স্তর বিশিষ্ট বিভিন্ন রঙের চা।

এই হরেক রঙের চা দেখে অভিভূত হলাম আমরা। কয়েক রঙা চা খেতে উৎসুক হয়ে উঠলাম।

লোকটি চা বানানোর এক ফাকে আড়চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ভাইজানরা কি চা খাবেন?

বললাম, হ্যা, আমাদের সবাইকে দুই রঙা পাচ গ্লাস চা দেন। আচ্ছা, দুই রঙা চা প্রতি গ্লাস কতো নেন।

দুই রঙা দশ টাকা এবং পাচ রঙা খেলে পঞ্চাশ টাকা লাগবে।

কেন, পাচ রঙা পঞ্চাশ টাকা কেন?

পাচ রঙা চা বানাতে পরিশ্রম বেশি তো, তাই।

তারপর চা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করি, কি নাম আপনার, কবে থেকে এই কয়েক রঙ চায়ের উদ্ভাবন করলেন?

আমার নাম রমেশ। প্রায় ছয় মাস ধরে এ ধরনের চা আবিষ্কার করেছি।

এটা কি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর? সায়েন্টিস্টরা কি বলেছেন?

না এই চা খেলে কোনো ক্ষতি হয় না। ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করা হয়েছে। বাংলাদেশ *টি রিসার্চ ইন্সটিটিউট* পরীক্ষা করে দেখেছে কোনো সমস্যা নেই।

আপনি কাপে চা না বানিয়ে কাচের গ্লাসে চা বানান কেন?

কারণ কাপের মধ্যে চা বানালে রঙের ব্যবধান ধরা পড়ে না। কিন্তু কাচের গ্লাসের বাইরে থেকে চায়ের স্তর ও বিভিন্ন রঙ বোঝা যায়।

রমেশ এখন আর বিটিআরআই-এ নেই। বিটিআরআই থেকে একটু দূরে রামনগর বস্তির কাছে একটি ছোট্ট দোকানে বসে তার উদ্ভাবিত বিভিন্ন রঙের চা বিক্রি করেন।

রমেশ তার দোকানের নাম দিয়েছেন *নীলকণ্ঠ*। এ প্রসঙ্গে রমেশকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দেন, বাহারি রঙের চা সম্পর্কে সবাই কৌতূহলী, সবার কাছেই আমার উদ্ভাবিত এই কয়েক কালার চা রহস্যজনক মনে হয়। তাই আমার দোকানের নাম দিয়েছি *নীলকণ্ঠ*।

বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, শ্রীমঙ্গল থেকে

তখন

– মুজিব

১৯৮৬ সালের ঘটনা। আমি তখন ক্লাস নাইনের ছাত্র। আমার জন্ম পাবনা জেলার প্রত্যন্ত একটি গ্রামে যেখানে বিদ্যুতের আলো এখনো পৌছেনি এবং যোগাযোগের মাধ্যম দ্বিচক্রযান অথবা নৌকা। আমি সম্পূর্ণভাবে গ্রামের ছেলে।

পারিবারিক অর্থ-বৈভব অনেক থাকলেও চায়ের প্রচলন তখন গ্রামে তেমনভাবে চালু হয়নি। বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান পর্বে যেমন কোনো ভালো আত্মীয় অথবা বিশেষ কোনো সম্মানিত ব্যক্তি বাড়িতে এলে তবেই চায়ের আয়োজন হতো যা শুধু বড়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো। শুধু বাংলা রচনায় বইতে চা সম্পর্কিত রচনা ছাড়া পরখ করে দেখার সৌভাগ্য তখনো হয়নি।

১৯৮৫ সালের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আমাকে ভর্তি করা হলো থানা সদরে অবস্থিত সেন্টার স্কুলে ভালো কিছু করার প্রত্যাশায়। বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব ছয় কিলোমিটার হওয়াতে যাতায়াতের খুব সমস্যা হতো। তাই লেখাপড়ার সুবিধার জন্য আমাকে রাখা হলো স্কুল সংলগ্ন মেসে।

মেসটিতে শুধু প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা ছেলেরাই থাকতো। মেসে থেকেই লেখাপড়া শুরু করলাম। অল্প দিনের মধ্যেই কিছু ভালো ছেলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হলো। তাদের মধ্যে একজন ছিল বেশ আধুনিক। বন্ধুটির বাবা সরকারি কর্মকর্তা হওয়াতেই তারা আধুনিকতার ছোয়া পেয়েছে অন্যদের তুলনায় একটু বেশি।

একদিন বন্ধুটির বাড়িতে গেলাম। বন্ধুটি আমাকে একটি সাজানো-গোছানো, পরিপাটি ঘরে বসিয়ে রেখে কিছু সময়ের জন্য বাইরে গেল। এখন বুঝি সেটা ছিল ড্রয়িংরুম, আমরা যাকে *খানকা* বলতাম। কিছু সময় পরে বন্ধুর বোনটি একটি ট্রেতে করে আমার জন্য কিছু নাশতাসহ চা নিয়ে হাজির হলেন।

বন্ধুর বোনটি সম্পর্কে আগে থেকেই জানা ছিল। আমার সম্পর্কেও তিনি শুনেছিলেন। বন্ধুর বোনটি আমাদের চেয়ে এক ক্লাস উপরে পড়তেন এবং বেশ সুন্দরী ও স্মার্ট। কিছুটা নার্ভাস ফিল করতে লাগলাম বিশেষ করে দুটি কারণে।

এক. চা পানের কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আমার ছিল। কিন্তু চায়ের সঙ্গে অন্য খাবার মিলিয়ে অর্থাৎ কোনটার পর কোনটা খেতে হবে এটা আমার জানা ছিল না।

দুই. এমনিতেই অপরিচিত কোনো মেয়ে মানুষের সামনে কোনো কিছু খেতে পারতাম না। তারপর বন্ধুর বোনটি ছিলেন তরুণী এবং সুন্দরী। এই অবস্থায় আমার কপাল ও নাকের মাথায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করলো।

আমার এই ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা তিনি বুঝতে পারলেন কি না জানি না। তবে তিনি আমাকে বললেন, তোমার বৌ তোমাকে খুব ভালোবাসবে। যাদের নাকের মাথায় ঘাম জমে তাদের বৌ খুব ভালোবাসে। নাও বিস্কিট চানাচুর খেয়ে চা খাও।

তার কথা মতো বিস্কিট চানাচুর খেয়ে চা খেয়ে ফেললাম। কিন্তু বিপত্তি ঘটলো আবার যখন চা খাওয়ার পরেই পানি খেতে গেলাম।

বন্ধুর বোনটি বললেন, চা খাওয়ার পর পানি খেতে নেই। একটু পরে খাও।

এরপর আমি আর লজ্জা ধরে রাখতে পারিনি। মনে হলো, ধরনি দ্বিধা হও কোনো মতে পালিয়ে বাচি। আমার নাক মুখ থেকে গরম বাতাস বের হতে থাকলো। মনে হলো যেন সমস্ত পৃথিবী কাপছে। অথচ এই আমি গ্রামের দুরন্ত ছেলেদের একজন। বিস্তীর্ণ মাঠে ঘুড়ি উড়ানো, সবচেয়ে উচু গাছ থেকে পাখির বাসা ধরা আর সাতরে নদী পার হওয়ার মতো দুরন্তপনায় কোনো কমতি ছিল না।

অথচ আজ আমি কতো অসহায়! সামান্য একটু সামাজিকতার কাছে নির্মমভাবে পরাজিত।

বন্ধুটি ফিরে এলে দ্রুত স্থান ত্যাগ করি। এরপর আর কোনোদিন সেখানে যাওয়া হয়নি।

এই লজ্জাস্নাত মুহূর্তটি আমাকে অনেক দূরে নিয়ে এসেছে। সত্যিই অনেক দূরে। স্কুল ছেড়ে কলেজ, তারপর ইউনিভার্সিটিতে। অনেক পরিবর্তন। গ্রামের সেই কর্দমাক্ত জীবন বোধ আর মাটির গন্ধ গা থেকে ঝরে পরেছে। আমি হয়ে গেছি ইউনিভার্সিটির সবচেয়ে আধুনিক ছেলেদের একজন।

হঠাৎ একদিন বন্ধুর বোনটির সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে দেখে খুবই অবাক হয়েছিলেন। তার বিশ্বাস করতেই কষ্ট হয়েছে যে, আমিই সেই মুজিব।

সময়ের পালা বদলে বদলেছে অনেক কিছুই। কিন্তু বদলায়নি আমার প্রাইমারি স্কুলের সেই বাল্যবন্ধুটি। আমি এখন ইউনিভার্সিটির অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। আধুনিকতার তুঙ্গে অবস্থান করছি।

একদিন হঠাৎ সংবাদ পেলাম বন্ধুটির বিয়ে আর তাতে অবশ্যই আমাকে থাকতে হবে।

হাজির হলাম বিয়ের দিনে। মহিষের গাড়িতে চড়ে আমরা চললাম বরযাত্রী হিসেবে। আমাদের গ্রামের পাশের গ্রামেই বিয়ে।

দুপুর নাগাদ আমরা কনের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। কিছু সামাজিকতার পর শুরু হলো অ্যাপায়ন পর্ব। বিস্কিট, শরবত আর চা। বরকে শরবত পান করালেন বিভিন্ন বয়সের কিছু পুরুষ মহিলা। এরপর বিস্কিট খেলাম আমরা সবাই। অবশেষে শুরু হলো চা পরিবেশনের পালা।

একজন ভদ্রলোক চা পরিবেশন করছিলেন। বরকে একটি সুন্দর মগে চা দেয়া হলো।

বর ভাবলো শরবত। এর আগে কোনো এক অপরিচিত মহিলার মরিচের শরবত খেয়ে বরের মাথা গরম হয়ে ছিল। ফলে যা হবার তাই হলো। শরবত ভেবে অনেকটা চা মুখে দিয়েই অসহ্য গরমে তা ফেলে দিল মুখ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে গেল তার পাজামা–পাঞ্জাবি। কিন্তু ঘটনা এখানেই শেষ নয়।

বর ভাবলো তাকে ঠকানোর জন্যই শরবত এতো বেশি গরম করা হয়েছে। আর যায় কোথায়! চায়ের মগ পরিবেশনকারীর গায়ে ছুড়ে মেরেই লাফিয়ে উঠলো হুংকার দিয়ে।

এ বিয়ে করবো না, শালারা আমাকে চেনে না, আমার সঙ্গে ফটকাবাজি, ইত্যাদি।

আমরা সবাই হতবাক। কোনো কিছু বোঝার আগেই লেগে গেল হট্টগোল। বরকে কোনোভাবেই শান্ত করা যাচ্ছে না। অবশেষে অনেক কষ্টে তাকে তার ভুল ভাঙাতে পারলাম।

সে লজ্জিত হলো। অবশেষে বিয়ে হলো।

এখন তারা অনেক সুখী। আধুনিক সমাজের বাইরে সে এক সুখী সমাজ। আর এই সভ্য সমাজের সর্বাধুনিক পরিবেশেও আমার নাকে আর ঘাম জমে না।

যাহোক পাঠক, সময়ের আবর্তে দিন চলে গেছে, চলে গেছে অনেকগুলো বছর। আমি ইউনিভার্সিটির শেষে কর্মক্ষেত্র, তারপর সংসার। এই বিশাল পরিবর্তনের ঘূর্ণিপাকে জটিল জীবনের চক্র হয়েছে বক্র। আর সেই জটিল চক্র পথে চলতে চলতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি তখন এক কাপ ধূমায়িত চা-ই ফিরিয়ে দেয় সকল সজীবতা, সকল তেজ। ফিরে পাই কর্ম প্রেরণা।

অবসরের আড্ডায় কখনো চলে যাই কোনো কফি হাউসে। আর তখনি মনে পড়ে সেই অতীত দিনগুলোর কথা। মনে হয়, হায়, তখন কতোই না বোকা ছিলাম! পরক্ষণেই অস্ফুটস্বরে বেরিয়ে আসে আরেকটি কথা। হায়! তখন কতোই না ভালো ছিলাম।

md_rha@yahoo.com

মালয়শিয়ান

- এহসানুল কবীর

ধারণাই ছিল না, মালয়শিয়ান চায়ের প্রস্তুত প্রণালী ভেদে এতো বিচিত্র নাম-ডাক হতে পারে। মালয়শিয়ায় এসে সেই অভিজ্ঞতা হলো।

প্রথম অভিজ্ঞতাটা হলো মালয়শিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমানে চেপে প্রথম যেদিন মালয়শিয়া পাড়ি জমাচ্ছিলাম সেদিন। দেখলাম বিমানে বসে এক মালয় যাত্রী চায়ের সঙ্গে বরফ মিশিয়ে পান করছেন। সেদিন তার এই অভাবনীয় কাণ্ড দেখে এতোই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, চা পানের আর রুচিই থাকলো না।

এয়ারহস্টেস থেকে গরম কফি চেয়ে চা পানের তৃষ্ণা নিবারণ করেছিলাম। পরে অবশ্য মালয়শিয়ায় এসে দেখলাম এই চা পান তাদের কাছে অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। মালয়শিয়া প্রচণ্ড গরমের দেশ বলে তাদের কাছে গরম পানীয়ের চেয়ে ঠাণ্ডা পানীয়ের কদর বেশি।

এবার বলি মালয়শিয়ান চায়ের বহুমাত্রিক নামকরণের মাহাত্ম।

চা-কে মালয় ভাষায় বলা হয় তে। আপনি দোকানে বা রেস্টুরেন্টে গিয়ে এই তে শুধু চাইলেই হবে না। আপনি কি ধরনের চা পান করতে চান সেটাও বাতলে দিতে হবে। যেমন ধরুন, আপনি যদি চা দুধ চিনিসহ পান করতে চান তাহলে বলতে হবে *তে সুসু*। সুসু অর্থ দুধ, সঙ্গে চিনি তো থাকছেই। আবার যদি দুধ ছাড়া চা পান করতে চান তাহলে বলতে হবে *তে-ও*। আবার দুধ চিনি ছাড়াই শুধু লিকারযুক্ত চা পানের জন্য বলতে হবে তে কোসং। কোসং অর্থ শূন্য বা খালি। বরফযুক্ত ঠাণ্ডা চায়ের নাম হলো *তে আইস* এবং গরম চায়ের নাম হলো *তে পানাস*। পানাস অর্থ গরম। তাদের ভাষায় গরম অর্থ আমাদের ভাষায় লবণ।

মালয়শিয়ায় চায়ের আরেকটা প্রস্তুত প্রণালী রয়েছে যার নাম বলে *তে তারিক*। তারিক অর্থ ধাক্কা মারা (Push)। এটার প্রস্তুত প্রণালী হলো দুধ চিনি মিশ্রিত চা দুটি মগে নিয়ে একটা থেকে আরেকটায় পর্যায়ক্রমে ঢালতে থাকলে যে ফেনামুক্ত চা তৈরি হয়ে সেটাই। আমি অবশ্য এই ধাক্কামারা চা-টাই একটু পছন্দ করি। কারণ স্বাদের দিক থেকে এই ধরনের চা একটু পানের যোগ্য, অন্যগুলো বিস্বাদ।

বলা দরকার, মালয়শিয়ান চায়ের গুণগত মান আর তার বিচিত্র প্রস্তুত প্রণালী এবং পরিবেশনা আমাদের দেশের চায়ের থেকে অনেক নিম্নমানের। মালয়দের এই অদ্ভুত নিম্নমানের চা পানে ইনডিয়ান উপমহাদেশের মানুষদের কখনোই তৃপ্ত হতে দেখিনি।

মালয়শিয়ার বিশাল রাজ্য পাহাং। তারই একটি জায়গার নাম ক্যামেরুন হাইল্যান্ড। সবুজের আল্পনার চাদরে মোড়ানো আকাশে হেলান দিয়ে ঘুমানো ঢেউ তোলা পাহাড়ের সারির ওপর দিয়ে ভেসে বেড়ানো শাদা মেঘের

ভেলার এই জায়গাটি দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় টুরিস্ট স্পট। এখানেই রয়েছে মালয়শিয়ার চা বাগান। নাম দেয়া হয়েছে *ইনডিয়া টি গার্ডেন।*

এ নামকরণের পেছনের কারণ হলো ইনডিয়া থেকে চা শ্রমিক, কর্মচারী এনে এখানে চা-এর আবাদ করা হয়েছে। কিন্তু তাদের তৈরি চা যে এতো বিস্বাদ তা কেবল ভুক্তভোগীরাই জানে।

জাপানিজ এক ইয়াং ডাক্তার স্বল্পকালীন ট্রেনিংয়ে মালয়শিয়ায় এলে কর্মসূত্রে তার সঙ্গে পরিচয়, বন্ধুত্ব। ট্রেনিং শেষে বিদায়বেলা সে আমাকে কিছু উপহার দিল। তাকে বাংলাদেশ থেকে আনা এক প্যাকেট চানাচুর খেতে দিলাম।

খুশি হয়ে সে স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে বললো, তোমাদের বাংলাদেশের চা আমাদের খুবই প্রিয়।

বিদেশে দেশের মতো বদনামের ভিড়ে কাজুমিসি নামের এই জাপানিজের মুখে এ কথাটি শুনে বেশ ভালোই লেগেছিল। কাজু আজও ইমেল করে আমার খোজখবর নেয়।

শ্যামনগর, সাতক্ষীরা থেকে

এক ঢৃপে দশ কাপ ...

– আবদুল্লাহ খান

ছোটবেলায় একবার চাচার হাত ধরে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে প্রথম ফৃ চায়ের স্বাদ পেয়েছিলাম। কিন্তু ওই চায়ে তৃপ্তির নাম মাত্র ছিল না। দেখতে ছিল অনেকটা পুকুরের ঘোলা পানি। ভোটের চায়ের বোধহয় কোয়ালিটি এটাই।

এরপর ১৯৬৮ সালে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে শ্রীমঙ্গল বেড়াতে যাই। খালু ওখানকার প্রেমনগরের চা বাগানের ম্যানেজার। চা বাগানের সবুজ পরিবেশে পরিপাটি করে সাজানো বাংলোটি সত্যিই মনোরম। অনেক দিন সজ্জনকে কাছে পেয়ে খালু-খালার যত্নের পর আত্তির শেষ ছিল না। প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর কাজের ছেলেটি চা ভর্তি কাপ রেখে যায় টেবিলে। কি আশ্চর্য! প্রতি কাপ চায়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ। এখানে এসে মাস খানেকের চা বাগান ভ্রমণ আমাকে রীতমতো চাখোর বানিয়ে ছেড়েছে।

জিয়ারতের উদ্দেশ্যে একবার ইনডিয়ার রামপুর শরিফে গিয়ে তথাকার সাজ্জাদানশীন ওবায়দুল্লাহ খান সাহেবের আতিথ্য গ্রহণ করি। তিনি নিজ হাতে কাপে চা ঢেলে আমাকে আপ্যায়িত করলেন। চা খাওয়া শেষ হলে যথাস্থানে কাপ রাখতেই তিনি কেটলি থেকে চা ঢেলে আবার কাপ ভরে দিলেন। উপায়ান্তর না দেখে দ্বিতীয় কাপ চা শেষ করলাম।

এবার স্মিত হেসে তিনি তৃতীয়বারের মতো কাপে চা ঢালতে উদ্যত হলে হাত দিয়ে বারণ করে জানালাম, যথেষ্ট হয়েছে আর খাওয়া যাবে না।

তিনি আশ্বস্ত হয়ে আমার কাপটি উপুড় করে পিরিচে রেখে বললেন, এখানকার রেওয়াজ হচ্ছে চা খেতে না চাইলে পিরিচের ওপর কাপ উল্টিয়ে রাখতে হবে।

এখানে এসে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম।

ফেরার পথে ট্রেন মোঘলসরাই স্টেশনে এসে থামলে ভারতের ঐতিহ্যবাহী মাটির ছোট কাপে চা খেলাম। এলাচ ও পদিনার গন্ধে ভরপুর। চলতি পথের এই চায়ে অন্য রকম স্বাদ পাওয়া গেল।

দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে কলকাতা এসে মারকুইজ স্ট্রিটের পরিচিত একটি হোটেলে অবস্থান নিলাম। হোটেলের রুমে ঢুকে সটান শুয়ে পড়ি কোমল বিছানায়। রিমোট কন্ট্রোলে অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা চালিয়েও বাংলাদেশের কোনো টিভি চ্যানেল খুজে পাওয়া গেল না। অবশ্য ম্যানেজারকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, এখানকার কেবল অপারেটররা বাংলাদেশি চ্যানেল চালাতে রাজি নয়। কি আশ্চর্য!

আমাদের দেশে দেখা যায় এর ভিন্ন রূপ। ইনডিয়ার চ্যানেল দর্শন ছাড়া আমাদের ভাত হজম হয় না। হায়রে বাংলাদেশ!

বিকেলে নিউ মার্কেটে বেড়াতে গেলে গেটের মুখেই কাপ ভর্তি চা হাতে আহ্বান জানালো এক বিক্রেতা। মোটা কাগজে বানানো চায়ের কাপটি এতো ছোট ছিল যে তা হাতে ধরে রাখতে রীতিমতো কসরত করতে হয়েছে। লেবুর রসে বানানো পাতলা ফিকে চা যে এতো সুস্বাদু হতে পারে তা আগে জানা ছিল না।

ফুরুৎ করে এক ঢোকে সবটুকু চা গিলে কাপটি কেটলির পাশে রাখতেই সে আবার চা ভরে দিল। এভাবে চা খেতে দারুণ মজা পেলাম। এভাবে আমি খেতে থাকলাম, সে ঢালতে থাকলো। দারুণ পরিতৃপ্তি নিয়ে কাপটি ফেরত দিতেই সে জানালো, আমি ইতিমধ্যে দশ কাপ চা শেষ করেছি।

আমার চোখ ছানাবড়া। বলে কি দশ কাপ! এতো চাট্টিখানি কথা নয়। অবশ্য ছোট কাপ বলেই কথা।

এখানে লজ্জার মাথা খেয়ে বাল্যবন্ধু একরামভাইয়ের বাসায় যাই।

চা ব্যবসায়ী একরামভাই আমার আগমনের কারণ অনায়াসে বুঝতে পেরে তাকে রাখা এক কিলোর স্পেশাল চায়ের প্যাকেট আমার হাতে ধরিয়ে দেন।

আমি দারুণ খুশিতে বাসায় ফিরি।

চট্টগ্রাম থেকে

চা ও মোহনা

– এম. হাসান পারভেজ

২০০৩ সালের শেষের দিকে সিলেটে আমার বন্ধু হোসেনের কাছে বেড়াতে যাই। তার সঙ্গে আমার আগে কখনো দেখা হয়নি। প্রথম আলোর আলপিন–এর মাধ্যমে পরিচয়। ডাকাদক্ষিণ টিলার ওপর তাদের বসবাস। বিকাল প্রায় চারটায় বন্ধুর বাড়ি খোজ করছি। সামনে ছোট–বড় পাচটা মেয়ে ঝুড়িতে কি নিয়ে নেমে আসছে। অপরিচিত এলাকা। তাই কিছুটা ভয় এবং লজ্জায় এক পাশে দাড়িয়ে আছি।

শুনেছি পাহাড়ি মেয়েরা নাকি উত্তেজিত থাকে এবং বাঙালিদের পছন্দ করে না। তাই কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহসও পাচ্ছি না। কিন্তু এদেরকে জিজ্ঞাসা না করলেও হবে না। তাই সৎ সাহস নিয়ে ছোট একজনের পাশে গিয়ে আপু বলে ডাক দিতেই সবাই থমকে ঘুরে দাড়ালো এবং আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো।

ছোট আপুর হাতে ঠিকানা দিয়ে বাড়ি দেখাতে বললাম। সে মোহনা দিদি (ছদ্মনাম) বলে ডাক দিলে দেখলাম সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটা এগিয়ে এলো এবং ঠিকানা নিয়ে বললো, আসেন।

তাদের সঙ্গে একটু যাওয়ার পর তিনজন একটা বাড়িতে ঢুকে গেল।

মোহনা আর কণিকা আমাকে নিয়ে হাটছে। কণিকা হলো ছোট আপু। তাদের সঙ্গে সামান্য পরিচয়ে জানলাম তারা হিন্দু এবং পাহাড়িদের চেয়ে আলাদা।

আমাকে হোসেনের বাড়ির সামনে রেখে বিদায় নিয়ে চলে গেল। হোসেনদের সবার সঙ্গে ভালো ভাবে পরিচিত হলাম। রাতে শোয়ার পর ঘুম আসছে না। শুধু বার বার মোহনার চেহারা চোখে ভেসে উঠছে। তারপরও সামান্য ঘুমালাম।

সকালে মোহনাকে দেখতে খুব ইচ্ছা করছিল। কিন্তু নতুন বন্ধু হিসেবে হোসেনকেও কিছু বলতে পারছি না। তবুও সকালে ঘুরতে রাস্তায় বের হয়ে দেখি মোহনা একা স্কুলে যাচ্ছে। তাকে দেখে যেন প্রাণ ফিরে পেলাম।

মোহনা সামনে আসতে, কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করলে বললো, ভালো আছি।

আবার বললাম, কোথায় যাচ্ছেন, স্কুলে?

সে একটা হাসি দিয়ে বললো, না, বিদ্যালয়ে যাচ্ছি। একথা বলে একটু সামনে গিয়ে হোসেনভাই বলে ডাক দিয়ে হোসেনের সঙ্গে কি যেন কথা বললো।

অসহায়ের মতো দাড়িয়ে আছি।

কথা শেষে হোসেন হাসি মুখে এগিয়ে এলো। হাসির কারণ জানতে চাইলে হোসেন বললো, মোহনা তোমাকে নিয়ে তাদের বাড়িতে যেতে বলেছে।

বিকেলে আবার মোহনাকে দেখার উদ্দেশ্যে বের হলাম। কিন্তু তাকে না দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

রাতে আবেগ সংবরণ করতে না পেরে হোসেনকে আমার দুর্বলতার কথা জানালাম। এবং বললাম, মোহনাকে আমি শুধু বন্ধু হিসেবে পেতে চাই।

হোসেন আমাকে প্রথমে বোঝাতে চেষ্টা করে পরে ব্যর্থ হয়ে সহযোগিতার আশ্বাস দিল।

পরদিন শুক্রবার, স্কুল বন্ধ। সকালে হোসেনের সঙ্গে মোহনাদের বাড়িতে গিয়ে মোহনাকে পেলাম।

সে হাসি মুখে ঘরে নিয়ে গেল। মনে হয় আমাদের আগমনের অপেক্ষায় ছিল।

তার মা এলে তার সঙ্গে পরিচিত হলাম। আমি মুসলিম ও ভিন্ন জেলার বলে খুব আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বললেন।

ছোট বোন কণিকা এলে তাকে মোহনা একটু ইশারা করতেই সে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর মোহনা চা, সন্দেশ ও কিছু নাশতা নিয়ে এলো।

হোসেন চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে রান্নাঘরে মোহনার মায়ের কাছে চলে গেল।

বুঝতে পারলাম এটা আমাদের কথা বলার সুযোগ দান। বুঝতে পারলাম ঘরে আর কেউ নেই। তাই আস্তে আস্তে কথা শুরু করলাম। জানলাম সে ক্লাস টেন-এ পড়ে।

এদিকে আমি কিছু খাচ্ছি না দেখে একটু গম্ভীর স্বরে বললো, আমরা হিন্দু তাই পছন্দ হচ্ছে না, তাই না?

আমিও দুষ্টুমি করে বললাম, না খাইয়ে দিলে হিন্দুর আন্তরিকতা বুঝবো কিভাবে!

আমাকে অবাক করে দিয়ে মোহনা নিজের হাতে সন্দেশ ও চা খাইয়ে দিল।

বললাম, এটা কিসের লক্ষণ।

সে বললো, ভালোবাসার। এ কথা বলে দৌড়ে চলে গেল।

ততোক্ষণে হোসেনও ঘুরে ঢুকলো।

কিছুক্ষণ পরে মোহনা এসে বললো বিকেলে টিলায় চা বাগানে আসবেন।

তারপর বিদায় নিয়ে চলে আসি। বিকেলে হোসেনের সঙ্গে চা বাগানে গিয়ে কিছুক্ষণ বাগানের চারপাশে ঘুরলাম। সঙ্গে ক্যামেরা ছিল। তাই কিছু ছবি তুললাম।

বাগানটা তেমন বড় নয়। কিন্তু প্রথম চা বাগান দেখা। তাই খুব ভালো লাগছে।

কিছুক্ষণ পর মোহনা তার বোন কণিকাকে নিয়ে এলো।

প্রথমে তাদের একটা ছবি তুললাম।

তাদের সঙ্গে আমিও একটা ছবি তুললাম।

কিছুক্ষণ হেটে এক জায়গায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছি। সেখানে আরেকটা ছোট মেয়েকে দেখে কণিকা ওই মেয়েটার সঙ্গে একটু দূরে গিয়ে খেলছে। আমি এ ধরনের সুযোগই এতোক্ষণ খুজছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে হোসেনকে বলে মোহনার সঙ্গে বাগানে আরো পাচ ছয়টা ছবি তুললাম।

হোসেনকে ইশারা করতেই সে কণিকার কাছে চলে গেল।

আমরা দুজন কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম।

তারপর মোহনা কথা শুরু করলো। আপনি এখানে কতোদিন থাকবেন?

বললাম, যতোদিন আপনি রাখবেন।

আমার কথা শুনে মোহনা চুপ করে আছে।

চুপ থাকার কারণ জানতে চাইলে অনুরোধ করে বললো, আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন।

তারপর বন্ধুত্ব শুরু। সে হিন্দু মুসলিম প্রসঙ্গে কিছুটা আপত্তি জানালে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে একটা কবিতা লিখে তার মমার্থ বুঝিয়ে দিলাম–

বন্ধুত্ব

বন্ধুত্ব এ বড় শক্ত বাধন
মিলে যদি উভয়ের মন
হিন্দু মুসলিম ধনী গরিব
সবই তুচ্ছ নিষ্প্রয়োজন।
সে আমাকে বোঝে
আমিও তাকে
হোক না ছেলে–মেয়ে
কি আসে যায় তাতে।
সুখ–দুঃখ, আনন্দ–বেদনা
ভাগ করে নেয় যে জন
সেই তো বন্ধু
সেই তো আপন।
বন্ধু পাওয়া সহজ ব্যাপার
ভালো বন্ধু কঠিন
বন্ধু ছাড়া চলে না তো
জীবন কোনোদিন।

এবং চা বাগান শপথ করে
আজও আমরা বন্ধুত্ব চালিয়ে যাচ্ছি।
আমার জীবনে চা এবং মোহনা সমান প্রিয় ও একই সূত্রে গাথা।

সোনাগাজী, ফেনী থেকে

উত্তম

- মোহাম্মদ শাহজাহান

উমদা হ্যায় আদম চা, আলা হ্যায় আদম চা – ষাটের দশকে শাদা–কালো টিভির পর্দায় ভেসে ওঠা তৎকালীন পাক টিভির কমেডিয়ান নান্নার (*আলিফ–নুন* কমেডি সিরিজ) গোলগাল চেহারাটি ছোট ছোট আকৃতি নিয়ে বৃত্তাকারে ঘূর্ণায়মান হয়ে যখন আদম চায়ের উপরোক্ত অ্যাডটি শত কণ্ঠে উচ্চারণ করতো তখন ছোট–বড় সকলের জানা হয়ে যেতো, আলিফ–নুন কমেডি সিরিজের পরবর্তী পর্ব এখুনি শুরু হতে যাচ্ছে।

আলিফ নুন কমেডি সিরিজটি যেমন জমেছিল ঠিক তেমনি একাকার হয়ে গিয়েছিল নান্না ও আদম চায়ের পরিচিতি। আমার মনে আছে, করাচি শহরের শতকরা পয়ত্রিশ চল্লিশ ভাগ বাসাবাড়িতে কেবল তখন টিভি–র আমদানি হয়েছে। আমরা ছিলাম নাহিদের দলে। তাই তখনকার টিভির একমাত্র কমেডি সিরিজটি উপভোগের উপায় ছিল আশপাশের প্রতিবেশীর ঘরের উন্মুক্ত গবাক্ষপথের সাহায্য নেয়া। আবার কখনো কখনো উন্মুক্ত কপাট পেয়ে গৃহে প্রবেশ করে সমবয়সী আরো ছেলেদের পেছনে নীরবে গিয়ে বসে পড়া।

যাদের গৃহে তখন টিভি ছিল তাদের মানসিক উদারতার কথা ভাবলে বর্তমান সময়ের শহুরে মানুষদের মনের সঙ্গে যেন বেশ বড় ব্যবধান আছে বলেই প্রতীয়মান হয়। অবশ্য গত প্রায় চল্লিশ বছরে মানুষের আদর্শ ও মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক, ব্যবহারিক আচার–আচরণেও বেশ পার্থক্য সূচিত হয়েছে, হয়েছে নিদারুণ অবনতি।

তাই এখন আগের মতো কারো ঘরের জানালায় দাড়িয়ে *নাই* সম্প্রদায়ের সদস্যদের টিভি দেখার কথা কল্পনাও করা যায় না।

সে যাক, চায়ের কথাতেই ফিরে আসছি। সে সময়ে *আদম*-এর সঙ্গে অন্য যে দুটি ব্র্যান্ডের চায়ের বেশি অ্যাড হতো সেগুলো ছিল *লিপটন* চা এবং *ব্রুকবন্ড চা*। ঢাকা বা বাংলাদেশের অন্য সব এলাকাতেও এগুলোরই আধিপত্য লক্ষ্য করা যেতো। তবে এ তিন ব্র্যান্ডের মধ্যে কোনটির বেশি চল ছিল, কিশোর বয়সের সেই স্মৃতি হাতড়ে এ ব্যাপারে সঠিক মন্তব্যটি করা সহজ ব্যাপার নয়। আমার তো মনে হয় প্যাকেটজাত চায়ের বাজারে এ তিনটি ব্র্যান্ডের জনপ্রিয়তা ও মার্কেট সমানে সমান ছিল। তবে বিজ্ঞাপনের বিচারে কমেডিয়ান নান্নার অ্যাডকৃত আদম চায়ের স্থান একধাপ উপরে ছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। সে তুলনায় লিপ্টন বা ব্রুক বন্ড চায়ের বিজ্ঞাপনের কোনো অপংশও মনের কোথাও হাতড়ে বের করে আনতে পারছি না। অবশ্য বর্তমান বাজারে একমাত্র লিপ্টন ও ব্রুক বন্ড চা বাদে অন্যটি অর্থাৎ আদম চায়ের উপস্থিতি নজরে পড়ে না। হয়তো বা পাকিস্তানে এখনো তা পাওয়া যায়। আশির দশকে কাজ উপলক্ষে চায়নার রাজধানী বেইজিংয়ে অবস্থানকালীন ব্রুকবন্ড চায়ের লাল রঙা প্যাকেট দেখে নষ্টালজিয়ায় ভুগতাম।

এতো গেল চায়ের সঙ্গে আমার শৈশবের বাহ্যিক পরিচয়ের একটি দিক। চায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়, মানে চা পান, চা দিয়ে আপ্যায়ন এবং আমার জীবনে চায়ের নানান বৈচিত্রময় কাহিনীর কিছু অভিজ্ঞতা পাঠকের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেবো বলেই আজকের এ উদ্যোগ। এ অভিজ্ঞতার সঙ্গে অবশ্য এতোক্ষণ চায়ের ব্র্যান্ড নামের যে কাহিনী বর্ণনা করেছি তার যোগসূত্র তেমন নেই বললেই চলে। যদিও চা পান শহুরে জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংগে পরিণত হয়েছে বহু আগেই তবুও স্বাদের তারতম্যের বিচারে যে বিশেষ চায়ের স্বাদ নিজের জিভের গোড়ায় আজ পর্যন্ত অনুভব করি তা হলো, শৈশবের করাচি শহরের রেস্তোরাগুলোতে পান করা দুই আনা দামের ধূমায়িত দুধ চা। যেমন ছিল তার রঙ তেমনি স্বাদে ও গন্ধে ছিল তা অতুলনীয়।

এ কথা স্বীকারে আমার দুঃখ হচ্ছে, পরে অর্থাৎ যৌবনে বাংলাদেশে (স্বাধীনতার পরে) এলে চা পানের মাঝে আগের সেই আনন্দ ও মাদকতা কখনো খুজে পাইনি। এবং এ পরম সত্যটি বার্ধ্যক্যের মধ্য গগন পেরিয়ে এসেও দ্বিধাহীন চিত্তে অকপটে স্বীকার করছি। আজো যেন শৈশবের করাচি শহরের রেস্তরায় বসে পান করা চায়ের (সঙ্গে একটি কি দুটি সমুচা) সে অনুপম স্বাদ অবচেতন মনে খুজে বেড়াই। ছোটবেলায় রেস্তোরার সেই দুই আনা দামের চায়ের স্বাদ বর্তমানের ফাইভ স্টার হোটেলগুলোতে প্রাপ্ত দশ বিশ টাকার চায়ের মাঝেও কেন যে খুজে পাই না। এর পেছনে কোনো মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণ নিহিত রয়েছে কি না, নাকি তা স্রেফ আমার শৈশবকালীন ফ্যান্টাসিময় জগতের একটি অংশ, হয়তো একটি গবেষণাগারের গবেষণার বিষয়।

চায়ের প্রতি নষ্টালজিক এ আকর্ষণের বিপরীতে চা পানজনিত আমার নানান সমস্যার ব্যাপার তথা পরিপাকতন্ত্রের হজমির দুর্বলতার বিষয়টিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। গ্যাস্ট্রিক রোগীর তাদের চিকিৎসকরা সাধারণত চা, কফি খেতে বারণ করে থাকেন। এই পরামর্শে আবার কিছু হেরফেরও হয়। সে কথায় পরে আসছি।

কারো কারো বেলায় চা পান সত্যিই ক্ষতিকারক। সে সূত্রেই প্রায় দুই দশকেরও উপর হলো চায়ের সঙ্গে কখনো আমার আড়ি আবার কখনো ভাব-এভাবেই সম্পর্কের উত্থান ও পতন ঘটে চলছে।

প্রসঙ্গক্রমে ছোটবেলারই একটি স্মৃতি মনে পড়ে গেল। একবার আমার বাবা কোনোক্রমে সন্ধ্যা পর্যন্ত চার কি পাচ কাপ চা পান করে ফেলেছিলেন। এক আত্মীয়ের বাসায় আড্ডাক্রমে যখন পঞ্চম কাপ চায়ের কাপে ঝড় তোলা শেষ হলো তখন তিনি যেন নিজের শরীরের অভ্যন্তরে বিচিত্র এক ঝড় অনুভব করলেন এবং কাউকে কিছু বোঝার সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ বেহুশ হয়ে পড়লেন।

সবাই ধরাধরি করে নিয়ে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে পাখার বাতাস, পানির ঝাপটা ইত্যাদি দিতে লাগলেন। প্রায় সাত আট মিনিট পরেই তার জ্ঞান ফিরে আসে এবং ধাতস্থ হতে আরো কিছু সময় নেয়।

আমি যে তারই সুযোগ্য সন্তান। তাই আমাতেও সে ধরনের কিছু ডাক্তারি বিজ্ঞাপনের ধারায় আসবে তা তো স্বতঃসিদ্ধ কথা।

চায়ের সঙ্গে আমার টক মধুর সম্পর্কের সবচেয়ে দীর্ঘ। যদিও হয়েছিল আজ হতে প্রায় ষোল সতেরো বছর আগে। চাকরি সূত্রে তখন আমি চায়না প্রবাসী।

একবার ব্যাংকক হতে এক পরিচিত ভদ্রলোক গেলেন তার ব্যবসায়িক কাজে এবং আমার আলয়েই অবস্থান করেছিলেন। তিনি সঙ্গে করে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে নিয়েছিলেন ঢাউস সাইজের বেশ কিছু কাগজি লেবু যার চামড়াতেও ছিল লেবুর রসেরই সমাহার। মজা পেয়ে প্রায় পয়তাল্লিশ দিন আমরা কর্তা-গিন্নি সকাল-বিকেল সে লেবু দিয়ে আয়েশ করে পান করে চলি *লেবু চা*।

তাই হলো আমার দীর্ঘ সময় গ্যাস্ট্রিক রোগে ভোগার নেপথ্য উপলক্ষ্য। যখন পুরনো গ্যাস্ট্রিক সমস্যাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো, তখন ডাক্তারের শরণাপন্ন হলাম। তিনি আমাকে দিয়েছিলেন ছয় মাসের আয়ুর্বেদিক ওষুধের একটি কোর্স। সে সময় সেই কোর্স শেষে গ্যাস্ট্রিক রোগ থেকে বেশ ভালো করেই আরোগ্য লাভ করেছিলাম। এরপরে প্রায় দশ বারো বছর এ রোগের কোনো লক্ষণ আর প্রকাশ পায়নি। যদিও পুনরায় চায়ের সঙ্গে সখ্যতা গড়তে বেশ সময় লেগেছিল।

পরিপাকতন্ত্রের বিশেষ ব্যারামটির কারণে চায়ের সঙ্গে আড়ি দেয়া আবার যখন একটু ভালো বোধ হয় তখন বুকে টেনে নেয়া। এ করেই আমাদের অম্লমধুর সম্পর্ক এখনো টিকে আছে। বেশি খারাপ লাগলে গৃহিণীর পীড়াপীড়িতে ডাক্তারের পরামর্শ নিতেও পিছপা হই না। অবশ্য এ ব্যাপারেও রয়েছে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কখনো কোনো ডাক্তার বলেন, একটু-আধটু চা খেলে তেমন ক্ষতি নেই, কেউ বা বলেন দুধ চা নয়, লাল চা খাবেন আবার অন্যজন বলবেন চা, কফি একেবারেই বাদ দিতে হবে, ওদের সঙ্গে কোনো প্রকারের সম্পর্ক বা হৃদ্যতা রাখা চলবে না।

বড়ই সমস্যার কথা, কারটা ছেড়ে কারটা শুনবো, দিশা করতে পারি না। অবশেষে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিই যতোক্ষণ বড় কোনো সমস্যা (ব্যথা) না হচ্ছে ততোক্ষণ দৈনিক অন্তত এক কাপ গিন্নির হাতের চা অবশ্যই খাবো। কারণ প্রতিদিন সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে ভোজন শেষে ওই এক কাপ চায়ের স্বাদ নেয়া থেকে এবং সঙ্গে সঙ্গে গিন্নিকে খুশি রাখতে (যখন প্রশ্ন করে চা চলবে তখন হ্যা বললে খুশি তিনি অবশ্যই হবেন) এর চেয়ে উত্তম বন্দোবস্ত আর কি হতে পারে!

আবুধাবি, ইউএই থেকে
shaju003@cmirates.net.ae

বন্ধু

- মুন্নুজান

চায়ের কাপ হাতে এলেই মনে হয় লুসিয়া যেন আমার পাশে এসে দাড়িয়েছে। ক্ষীণ তনু দীর্ঘাঙ্গী চেকোস্লাভাকিয়ান এক তরুণী যার দুটো চোখ ছিল কৌতূহল আর কৌতুকে সদা হাস্যময়। সে দিনে কতোবার যে চা খেতো, তার হিসাব রাখিনি। তবে কেন জানি আমার মনে হতো, তার গত চব্বিশটি বছর পার করেছে চা পানের মধ্য দিয়ে আর বাকি জীবনটাও বোধ হয় এভাবেই কাটিয়ে দেবে।

লন্ডনে যাবার পর আমি হলাম তার চা পানের সঙ্গী। কিন্তু সমস্যা হতো যখন *হারবাল চা* আমাকে পান করতে হতো। তখন গলার ওপারে পাঠানো আমার জন্য কষ্টকর হয়ে উঠতো। দুধ চিনিহীন অপরিচিত স্বাদ-গন্ধ প্রথম প্রথম মনে হতো পানের অযোগ্য। তাই প্রায়ই তার অলক্ষ্যে ঢেলে দিতাম। একদিন ওই ঢালতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলাম।

লুসিয়া আমার পাশে দাড়ানো।

পরদিন বাচ্চাদের স্কুলের জন্য তৈরি করে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিচে নামছি।

আমাকে দেখামাত্রই হাসি মাখা চোখে বললো, গুড মর্নিং।

আমিও তার প্রতিউত্তর দিলাম। তার চলে যাবার পর মনে হলো লুসিয়ার হাসিটা কেমন যেন অর্থবহ।

সবাই চলে যাবার পর বড্ড শীত লাগছিল। সাধারণত ঘরে শীতের কাপড় পরার প্রয়োজন পড়ে না। ওই দিন পরেও শীত কমছে না। মুখ হাত ধুতে গিয়ে দেখি কল দিয়ে তরল বরফ ঝরছে। কোনোমতে মুখ ধুলাম।

ততোক্ষণে লুসিয়া ফিরে এসে তার নিত্যদিনের কাজে লেগে গেছে। গলায় তার দেশীয় গানের সুর। আমুদে সুরে গুন গুন করে গাইছে আর কাজ করছে।

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, শীতে সে কেমন বোধ করছে।

গানের ভেতরে থেকেই উত্তর দিল, ওহ! ফাইন।

মনে মনে বললাম, ফাইন তো তুমি থাকবেই, তোমার দেশে যে এর চেয়েও বেশি শীত। এ ঠাণ্ডা তো তোমার জন্যে নস্যি। তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে, শীত সহ্য হচ্ছে না।

সে তখনো ওই গুন গুনানির মধ্য দিয়েই বললো, চা খাও, ঠিক হয়ে যাবে।

একটু পর সে চা এনে দিল। তাও আবার পদিনা পাতার চা বা মিন্ট টি (Mint Tea)। বললো, খাও, শীত থাকবে না।

দুনিয়াতে এতো অসংখ্য কিসিমের পানীয় থাকতে এই চা, কফি, মিন্ট টি, কালো গোলমরিচ বা ব্ল্যাক পেপার টি (Black Pepper Tea) হলো তার প্রিয় পানীয়। চোখ বুজে তার *মিন্ট টি* পান করলাম।

জানতে চাইলো, কেমন বোধ করছি?

মাথা নেড়ে বললাম, ফাইন।

লুসিয়া এ বাসায় আছে বাচ্চা দেখার জন্য। তাদের স্কুলে নেয়া–আনা, সাফাই, ধোলাই, ইস্ত্রি করা ছাড়া দুপুরে তার দায়িত্ব বাচ্চাদের জন্য লাঞ্চ তৈরি করার। এখানে সে লম্বা মাইনে পায়। থাকা ও খাওয়া ফৃ। সে তার দেশে স্কুলে পড়তো। শিক্ষিত, মার্জিত, রুচিবান একটি মেয়ে এখানে কাজকর্মের ফাকে একটি কলেজে ইংলিশ শেখে।

তপা তার ডিউটির পর ঘরে এলে বললাম, এ কয়েকদিন ধরে যখন আমি আর লুসিয়া ঘরে থাকি তখন ঘরে প্রচণ্ড শীত হয় আবার তোমরা ঘরে ফেরার আগেই ঘরের তাপ স্বাভাবিক হয়ে যায় রেডিয়েটর, পানি সব গরম হয়ে যায়। ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন যেন ভুতুড়ে ঠেকছে।

সে হেসে বললো, একা থাকলে কারো কারো অনেক সময় এমনটা মনে হতে পারে। ঠিক আছে, আগামীকাল এমন হলে প্লাম্বারকে ফোন করবেন, ও এসে ঠিক করে দিয়ে যাবে।

পরদিন স্কুলের জন্য খুব ব্যস্ততার মধ্যেও লুসিয়াকে দেখা গেল রেডিয়েটরের মিটার ঘোরাচ্ছে। ব্যাপারটা দেখার পর আস্তে করে উপরে উঠে গেলাম সিড়ির শেষ ধাপে। উঠে তাকে ডাকলাম, লুসিয়া, তোমার জন্য চা বানালে আমাকেও এক কাপ দিও।

আমরা টেবিলে বসে এক সঙ্গে গল্পের ভেতর দিয়ে চা পান করলাম।

এরপর থেকে লুসিয়ার সঙ্গে আমার একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। ঘরের ঠাণ্ডার সমস্যা দূর হয়েছে। তার সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে বেড়াতে যেতাম।

ছবি দেখতে, শপিং, জগিং, আউটিংয়ে সব কিছুতে সে আমাকে টেনে নিয়ে যেতো।

লুসিয়ার সান্নিধ্যে থেকে মিন্ট টি–তে অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম। দীর্ঘ ছয়টি মাস লুসিয়া আমার নিত্যদিনের সঙ্গী ছিল।

সময় ফুরিয়ে এলো। ফেরার পালা।

চলে আসার দিন সুন্দর একটি প্যাকেট আমার হাতে তুলে দিতে দিতে বললো, এতো দিন তোমার সঙ্গে যেসব ফান করেছি, দেশে গিয়ে যাতে আমাকে মনে রাখতে পারো তার জন্য করেছি। বলতে বলতে হঠাৎ সে থেমে গেল।

তার মুখের পানে তাকালাম। তার কৌতূহল আর কৌতুকে ভরা চোখ দুটোতে শুধু দুই ফোটা পানি টলমল করছে।

তাকে বললাম, লুসিয়া আনিসা ও আদলীনাকে ফেলে যেতে যতোটা কষ্ট হচ্ছে, তোমার জন্যও ততোটাই হচ্ছে। আমি কি কখনো তোমাকে ভুলতে পারি! চায়ের কাপ হাতে এলেই তো তোমার কথা আমার মনে পড়বে।

আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম থেকে

বাংলা স্টল

– ডা. রুছেলা মির্জা

আমি, আমার স্বামী ও আমাদের ছেলে তারিফ জাপানের নাগোয়া শহরে থাকি। জাপানে এসেই প্রথম আমার ধারণা হলো বিভিন্ন ধরনের চা সম্পর্কে। চাপাতা ছাড়াও বিভিন্ন ফুলের নির্যাস থেকে তৈরি (যেমন Jasmine Tea), গম থেকে তৈরি পানীয় (মুগি চা), আপেল থেকে তৈরি (Apple Tea) এক ধরনের চায়নিজ চা (উড়ন চা), চেরি ফুলের চা, লেমন চা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের চা ঠাণ্ডা পানীয় হিসেবে কোকাকোলা–পেপসির পাশাপাশির ভেনডিং Vending মেশিনে শোভা পাচ্ছে এবং এগুলোর চাহিদা অনেক বেশি। গৃন টি (জাপানিজ *ওচা*) দিয়ে তৈরি করে রকমারি পিঠা এমনকি আইসকৃমও।

জাপানিজরা পানি খায় না। পানির পরিবর্তে খায় ওচা। ছাকনিতে কিছু সবুজ চা পাতা দিয়ে তার ওপর ফুটন্ত গরম পানি ঢেলে দেয়। হালকা সবুজ বর্ণের একটু তেতো স্বাদের এই পানীয়টি এখন আমার দুই বছরের ছেলেরও ভীষণ পছন্দ।

চাইল্ড কেয়ার সেন্টারে থাকে বলে ভাতের সঙ্গে তার ওচা খাওয়ার অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু চা বলতে আমার চোখে ভাসে কনডেনস মিল্ক দেয়া, হালকা খয়েরি রঙের চায়ের খুশবু উড়ানো এক কাপ চা। এখানে ওচা খাওয়ার কাপটিও সাধারণ কাপের চেয়ে আলাদা। তাই আমার বাঙালি মন কখনো গৃন টি–কে চা বলে মেনে নিতে পারেনি। লাঞ্চ টাইমে অন্যান্য জাপানিজরা ওচা নিলেও আমি বসি পানি নিয়ে।

এবার মজার ঘটনাতে আসি। আমি নাগোয়া ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করছি। আরো বেশ কয়েকজন বাঙালি আছেন এখানে। গত বছর নাগোয়া ইউনিভার্সিটি ফেস্টিভাল–এ কয়েকজন বাঙালি ভাই ও ভাবীরা মিলে চার দিনব্যাপী বাংলাদেশি খাবারের স্টল দেন। যখন যার সময় মিলেছে আমরা গিয়েছি সাহায্য করতে। কখনো চিৎকার করেছি, *ইরাসসাই মাছে* বা ওয়েলকাম, স্বাগতম বলে। যারা স্টলের সামনে দিয়ে হেটে যাচ্ছেন তাদের বোঝানো হচ্ছে কতো মজার আমাদের খাবারগুলো। তখন আমরা একজন বয়স্ক মহিলাকে আটকানোর চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ সে মহিলা বাংলায় বলে উঠলেন, আমি চা খাবো।

আমরা হতবাক। প্রথমত. ভাষা বাংলা, দ্বিতীয়ত. চা আমাদের স্টলে নেই। খুব খারাপ লাগলো। হয়তো মহিলাটি বাংলাদেশে গিয়েছিলেন এবং চায়ের দোকানের মজার চা খেয়েছিলেন। সেই স্বাদ পেতে বাংলা স্টল দেখে তার চা খেতে চাওয়ার আবদার আমরা রাখতে পারিনি।

এ বছরও বাংলা স্টল দেয়ার প্ল্যান হচ্ছে। চেষ্টা করবো এবার স্টলে চা রাখতে।

নাগোয়া, জাপান থেকে

ইনডিয়ান এক্সপিরিয়েন্স

– রবিউস সানি প্রত্যয়

সকাল ছয়টায় পৌছালাম যশোর। সেখানে খানিকটা সময় বিশ্রাম নিয়ে কাছের রেস্তোরায় চা নাশতা খেয়ে বেনাপোল পার হয়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিলাম। হোটেলে পৌছানোর ঘণ্টা দুই আগে দুপুরের খাবার পথেই সেরে এক কাপ চা খেয়ে ফের বাসে উঠে নির্ধারিত হোটেল *প্যারামাউন্ট ইন্টারন্যাশনাল*-এ উঠলাম।

কলকাতায় যে কয়েকদিন ছিলাম তাতে সকাল-বিকেল চায়ের ব্যাপারটা রুম থেকে সেরে বের হতাম। এখানের চা আমাদের দেশের মতোই কাচের কাপে, স্বাদেও তেমনি।

তিন দিন পর রাত সাড়ে দশটার ট্রেনে হাওড়া স্টেশন থেকে জয়পুরের উদ্দেশে রওনা হলাম। দুই দিন দুই রাত ট্রেনে থাকতে হলো। পথে পথে খানিক পর পর ফেরিওয়ালার শব্দ, *এই চায়ে চায়ে*। পথে যতো স্টেশন ধরলো, ট্রেনের বাইরেও ওই একই শব্দ, *এই চায়ে চায়ে*।

ট্রেনে চা খেলাম প্লাস্টিকের লম্বা গ্লাসে। চায়ের ধরন একটু পাতলা। তবে জার্নিতে বেশ ঝরঝরে বোধ করেছি।

জয়পুরে পৌছে গেলাম। আগেই বুকিং দেয়া হোটেল *ব্রডওয়ে ইন্টারন্যাশনাল*-এ উঠলাম। জয়পুর যে কয়দিন থাকলাম, চা কখনো হোটেল ডাইনিংয়ে খেতে পারলাম না। খাবার সেরে চা ভর্তি লম্বা প্লাস্টিকের গ্লাস হাতে নিয়ে বাসে উঠে পারতাম। খেতে খেতে গাড়ি এগিয়ে যেতো দর্শনীয় স্থানগুলোতে।

এখানকার চা খুবই টেস্টি। গাঢ় দুধে বেশি পাতা দিয়ে তৈরি। জার্নিতে বেশ চাঙা লাগতো।

আজমির শরিফ ঘুরে আসার পথে কোনো চায়ের স্টল বা ফেরিওয়ালার চায়ে চায়ে ডাক শুনলাম না। প্রচণ্ড গরমে এখানে জুস, ফল-ফলাদি এবং শরবতের দোকানই বেশি চোখে পড়লো।

জয়পুর বেড়ানো শেষ করে আগ্রা রওনা দিলাম। পথে সম্রাট আকবরের ফতেপুর সিকরিতে ব্রেক দিলাম। বিকেলে গিয়ে পৌছালাম আগ্রায়। এখানে যে দুই দিন বেড়ালাম তাতে জুস ছাড়া চা তেমন খাওয়া হলো না।

আগ্রায় বিদায় ঘণ্টা বাজিয়ে রওনা দিলাম সিমলার উদ্দেশে। পথে পিঞ্জর গার্ডেনে বিশ্রাম এবং চা-নাশতা। এখানকার আবহাওয়া চমৎকার।

সিমলা পৌছার আগেই কেমন ঠাণ্ডা লাগলো। নাশতা সেরে সবাই একটা বড় চা স্টলে বসে চা খেলাম। এখানকার চা বেশ পাতলা। হালকা পাতা, খুব সামান্য দুধে বানানো চা। তবে মিষ্টি কড়া। এ চা স্টলটির পদ্ধতি একটু ভিন্ন। এখানে যে যার মতো বড় ট্রে থেকে কাপ নিয়ে নিজ হাতে ধুয়ে কেৎলি থেকে চা ঢেলে নিচ্ছে।

আমরাও সেভাবে চা পর্ব সেরে গাড়িতে উঠলাম। সন্ধ্যায় সিমলা পৌছালাম। *হোটেল সানরাইজ*-এ উঠলাম। এখানে পৌছে বুঝলাম প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। রাতে কুয়াশার মতো অঝোরে পাতলা তুলার মতো বরফ পড়ছে।

রাতের খাবারের পর এক কাপ গরম চা খেয়ে বেডে গেলাম। রাতে গায়ে কম্বল চড়াতে হলো।

পরের দিন সিমলা নগরী ঘুরলাম এখানের দোকানপাট, স্কুল-কলেজ, ইউনিভার্সিটি, হোটেল, রেস্তোরা, চা স্টল, বাজার, মন্দির সবই পাহাড়ের গায়ে থরে থরে সাজানো। এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে ওঠার জন্য ঘোরানো রাস্তা আছে। কোথাও আবার দীর্ঘ সিড়ি বানানো আছে।

পড়ন্ত বিকেলের শেষ আভাটুকু যখন পাহাড়ের ওপর পড়ে তখন নিচ থেকে বহু উপর পর্যন্ত ঘরবাড়িগুলো অপূর্ব সুন্দর লাগে।

গাড়ির ড্রাইভার বললো, স্যার, এখানকার মিষ্টি খুবই প্রসিদ্ধ।

রাতে মিষ্টি আনা হলো। সত্যিই অপূর্ব এর স্বাদ। গরম এক কাপ চা হাতে বেডে ফিরলাম।

পরের দিন খুব ভোরে মানালির উদ্দেশে রওনা হলাম। পাহাড়ি নদীর পাশ ঘেঁষে রাস্তা। কোথাও পাহাড়ের পেট কেটে ভেতর দিয়ে রাস্তা, কোথাও বা পাহাড়ে পাহাড়ে বৃজ, কখনো বা শ শ ফিট উপরে – এভাবেই মাইলের পর মাইল পার হয়ে পৌছে গেলাম মানালি।

পথে বিকেলের চা নাশতা সারলাম কুল্লু নগরীতে। এখানে সিমলা থেকেও প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। উঠলাম হোটেল *কেনিলওয়ার্থ ইন্টারন্যাশনাল*–এ।

দুই দিন মানালির দুর্গম পাহাড়ি এলাকা এবং বিখ্যাত আইস পয়েন্ট দেখলাম। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় এখানের চায়ের চুমুকে তৃপ্তিই ছিল আলাদা।

সন্ধ্যায় দিল্লির উদ্দেশে রওনা হলাম। পরের দিন বিকেল তিনটায় দিল্লির *হোটেল রাজ ইন্টারন্যাশনাল* উঠলাম। প্রচণ্ড ক্লান্ত শরীর। ফ্রেশ হয়ে দুপুরের খাবারের পর এক কাপ চা খেয়ে অনুভূতিটুকু বোঝার আগেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

সন্ধ্যায় রুমে বয় এসে চা, বিস্কিট, সঙ্গে দিল্লিকা লাড্ডু দিয়ে গেল।

খেয়ে বের হলাম দিল্লি শপিং মলে।

দুই দিন দিল্লি বেড়ালাম। দিল্লি রেলস্টেশন থেকে হাওড়া স্টেশন পৌছানোর ইচ্ছায় ট্রেনে চড়লাম সকাল ছয়টায়।

এক রাত দুই দিন পর হাওড়া পৌছালাম। ফেরার পথে এ দীর্ঘ সময়ে একই শব্দ, *এই চায়ে চায়ে*।

কলকাতা কয়েকদিন বিশ্রাম এবং কেনাকাটা করে ঢাকা ফিরলাম।

লম্বা জার্নিতে প্রতিটি দর্শনীয় স্থান ছিল মনকাড়া এবং চা পর্ব ছিল বড়ই আনন্দের।

তবে মানালিতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বরফের ড্রেস গায়ে চড়িয়ে বরফের গায়ে বসে চা খাবার আনন্দই ছিল আলাদা।

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

সশব্দ

– আল মাহমুদ

২০০০ সালের ঘটনা। ক্লাস সেভেনের ছাত্রীকে বিকেলে পড়াই। পড়ানোর মাঝে চা বিস্কিট চলে আসে। মাঝে মধ্যে দুজনে চা পান করি।

তারিখটা ঠিক মনে নেই। ফেব্রুয়ারি মাসের কোনো এক বুধবার। দুজনের জন্যই চা এলো।

হঠাৎ ইচ্ছা হলো শাপলার সামনে শব্দ করে চা খাবো। দেখি সে কি বলে!

আমি শো শো শব্দ করে চা পান করছি। একবার, দুইবার নাহ! কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই।

তৃতীয়বারের সময় চোখ তুলে তাকালো।

অপেক্ষা করছি বিস্ময়ের। কি বলে সে?

চতুর্থবারের শুশু শব্দ করতে যেই না শুরু করেছি অমনিই তার চায়ের কাপটা টেবিলে আছাড় মেরে চেয়ার পেছনে ঠেলে ক্ষিপ্র গতিতে বলা শুরু করলো। এমন অভদ্র লোকের সামনে আমি চা খাই না। আপনি এতো বড় হয়েছেন, অথচ চা খাওয়াটাও শেখেননি। অসভ্য!

ঘটনার আকস্মিকতায় আমি স্তম্ভিত হলাম। কেননা ব্যতিক্রমধর্মী, রাগী ছাত্রীটির কাছে একটা কিছু আশা করেছিলাম সত্য। কিন্তু এভাবে এতোখানি পাবো কল্পনাও করিনি।

তার মা ছুটে এলেন।

লজ্জায় কোথায় লুকাই নিজেকে।

এদিকে টেবিলে চা পড়ে বই ভিজে একাকার।

সব কিছু মুছে দেয়ার পর আবার যখন পড়াতে শুরু করি তখন তার শর্ত মেনে পড়াতে হয়।

শর্তটি ছিল, আর কখনো শব্দ করে চা খাওয়া যাবে না।

মাথা নেড়ে সায় দিলাম। কিন্তু না, এতেও নাকি চলবে না। বাধ্য হয়ে তিন সত্যি বলে রেহাই পাই।

আজ এতো বছর পর যখন মাঝে মধ্যে ফোনে কথা হয়, ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিলে কর্কশ কণ্ঠে বলে ওঠে, যা করেছিলাম ঠিকই করেছিলাম। উচিত ছিল আপনার মাথায় চা ঢেলে দেয়া। তাহলে বুঝতেন শব্দ করে চা খাওয়ার মজা।

মূলত ক্ষেপানোর উদ্দেশ্যে মাঝে মধ্যে বলি।

সে নিজেও উত্তরটা এমনিই দেয়।

অথচ যখন শান্ত স্বরে বলি, কখনো কি দেখেছো তোমার স্যার শব্দ করে চা খায়! হঠাৎ সেদিন এতো বেশি উত্তেজিত হয়েছিলে কেন?

ওপাশ থেকে শাসনের সুর, আবার ওই কথা বললে ভালো হবে না কিন্তু!

আজও দিনে প্রায় তিন চার কাপ চা পান করা হয়। চায়ের কাপে ঠোঁট নিতেই ওই দৃশ্য ভেসে ওঠে। মুহূর্তেই ঠোঁটের কোণে এক চিলতে মুচকি হাসির ঝিলিক বয়ে যায়।

জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি, ঢাকা থেকে

দুটি স্মৃতি

– সাতিয়া মুনতাহা নিশা

এক.

সিলেটের শ্রীমঙ্গলে আমরা গিয়েছিলাম আমাদের দেশের বিখ্যাত শিকারি সীতেশ আংকলের বাড়িতে। তার বাড়িতে একটা মিনি চিড়িয়াখানা আছে যেটা তার নিজ উদ্যোগেই তিনি গড়ে তুলেছেন। সীতেশ আংকলের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে আসার সময় তিনি আম্মুকে এক প্যাকেট চা উপহার দেন।

সেই চা ছিল লন্ডনে পাঠানোর জন্য প্রস্তুতকৃত বিশেষ চা। সিলেটে আমরা যেখানেই গিয়েছি, বোনাস হিসেবে পেয়েছি সিলেটের কমলা আর চা। আত্মীয়স্বজনদের জন্যও আমরা কিছু চা নিই। কিন্তু সীতেশ আংকলের দেয়া চায়ের প্যাকেটটা কখনোই হাতছাড়া করিনি। ঠিক করলাম যতো যা–ই হোক, এই প্যাকেট অন্য কাউকে দেবো না।

তারপর আমরা ঢাকায় ফিরে এলাম। সিলেট থেকে আসতে আসতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। আমরা সবাই খুব টায়ার্ডও ছিলাম। তাই ঘুম থেকে উঠতে প্রায় বেলা এগারোটা বেজে গেল। ঘুম থেকে উঠেই গেলাম আমার সেই চায়ের প্যাকেটটা দেখতে।

কিন্তু গিয়ে দেখি সর্বনাশ। সব চায়ের প্যাকেটই আছে, শুধু ওটাই নেই। এদিকে আমার মামাও নাকি মনে মনে ওই চায়ের প্যাকেটকে টার্গেট করে রেখেছিলেন। তিনিও এসে দেখেন চায়ের প্যাকেট লাপাত্তা! আমাদের তো মাথা খারাপ হওয়ায় জোগাড়। আমরা গিয়ে ধরলাম আম্মুকে।

আম্মু যা বললেন তা শুনে আমার ও মামার যা অবস্থা হলো তা আর বলার মতো না।

সকাল ছয় সাতটার দিকে বাসায় একজন অতিথি এসেছিলেন আব্বুর আগের কর্মস্থল থেকে। আমরা সবাই তখন ঘুমিয়ে ছিলাম। অতিথিকে বিদায় দেয়ার সময় আম্মু অত্যন্ত উদারতার সঙ্গে কয়েক প্যাকেট সিলেটের স্পেশাল চা গিফট করে দেন যার মাঝে কি না আমার ওই টার্গেটকৃত চা প্যাকেটটাও ছিল। যেহেতু আমরা কেউ–ই আম্মুকে আমাদের ইচ্ছার কথা জানাইনি, তাই আম্মুও জানতেন না যে ওই এক প্যাকেট চা আমার আর মামার কাছে কতোখানি স্পেশাল ছিল। এবং আমরাও ভাবিনি, সাতসকালে কোনো অতিথি এসে হাজির হবে!

আজও সেই চায়ের প্যাকেটটার কথা মনে হলে আফসোস করি।

দুই.

আমি বরাবরই অংকের প্রতি একটু ভীতু। তাই সব সময়ই অংকটা বাসায় টিচারের কাছে করি। যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি তখনকার কথা বলছি।

প্রতিদিনের মতো সেদিনও স্যার এসেছেন। আমাকে অংক বোঝাচ্ছেন। মাঝখানে এক সময় বাসার কাজের মেয়েটা এসে চা-নাশতা দিয়ে গেছে। সে সময় আবার আমার খালামণিরা বেড়াতে এসেছেন। সঙ্গে তার দুই পিচ্চি। খালার ছোট ছেলের নাম ফাহিম। বয়স তখন আড়াই কি তিন বছর হবে। আমার খুব ন্যাওটা, সারাক্ষণ আমার পিছু পিছু ঘুরবে।

যাই হোক স্যার চা খেতে খেতে অংক করাচ্ছেন। স্যার অর্ধেক চা খেয়ে অংক বোঝানোয় ব্যস্ত। এরই মাঝে ফাহিম আমার পড়া দেখতে এলো। আমি কিভাবে পড়ি সেটা দেখার ওর আবার খুব শখ। সেন্টার টি টেবিলে বসে পড়ছিলাম। ফলে টেবিলের জিনিসপত্র ফাহিমের হাতের নাগালেই ছিল। আমি এবং স্যার অংক নিয়ে ব্যস্ত থাকায় কেউ-ই ওর দিকে তেমনভাবে খেয়াল করিনি আর ওই টুকুন পিচ্চি কোনো অঘটন ঘটাবে এমন আশঙ্কাও মাথায় আসেনি।

হঠাৎ ফাহিম স্যারের আধখাওয়া চায়ের কাপটা টেনে নিল। আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ও ঢক ঢক করে এক চুমুকেই সব চা খেয়ে নিল। তারপর আমাদের কারো দিকে না তাকিয়ে হেলতে- দুলতে চলে গেল।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমি আর স্যার তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়!

সিদ্ধেশ্বরী লেন, ঢাকা থেকে

নির্বাচনী সাজেশন

– বাদল সিকদার

আগে নির্বাচন এলেই চা, পান, বিড়ি ব্যবসায়ীদের পোয়াবারো শুরু হতো। এখন অবশ্য চা, পান, বিড়ির বিনিময়ে ভোট সংগ্রহ কঠিন হয়ে গেছে। এখন কেউ এক কাপ চায়ে নিজেকে বিক্রি করতে চাইছে না। এখন নগদ টাকার পাশাপাশি মাংস-পোলাও আদায় করছে।

এখনকার ভোটাররা বিড়ির কথা শুনলে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। নির্বাচনের সময় তাদের চা, সিগারেট, 'ল' বা রঙ চায়ের বদলে দুধ চা। অনেকের মনোভাব এমন, এলাকার উন্নয়ন বড় কথা নয়, নির্বাচনের সময় কে কি রকম সন্তুষ্ট করে সেটাই বড় ফ্যাক্টর।

এক্ষেত্রে অনেকে আবার একধাপ এগিয়ে। তাদের থিওরি, যে যেভাবে পারো আগে খসিয়ে নাও। সিল কোন মার্কায় পড়বে তা ভোটের আগের দিন সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। এই নিয়মে দেখা যায়, একজন প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় গিয়ে দাড়ায় পচিশ থেকে ত্রিশ লাখ টাকা।

প্রায় হাফ ডজন প্রার্থী সর্বস্বান্ত হওয়ার বিনিময়ে একজন প্রার্থী জয়লাভ করে। সঙ্গত কারণে নির্বাচনে জয়লাভের পর এলাকার উন্নয়নের বদলে টাকা সুদ-আসলে উঠিয়ে নেয়ার চিন্তায় সে মগ্ন থাকে।

এসব কারণে নির্বাচনে ধুমধাড়াক্কা ব্যয়ের ধারা বন্ধ করা উচিত। আগে যেমন নির্বাচনের সময় চা-পান-বিড়ি দিয়ে আপ্যায়ন করা হতো। এখন সবাই বসে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত, ভোটার যাই খেতে চাক না কেন, চা-পান-বিড়ির বাইরে কেউ যেন তাকে কিছু না খাওয়ায়।

চা খাওয়ালেও খাওয়াবে *লাল চা*। অধিক আন্তরিক হলে লাল চায়ের সঙ্গে এক ফালি লেবু দেয়া যেতে পারে।

হারাগাছ, রংপুর থেকে